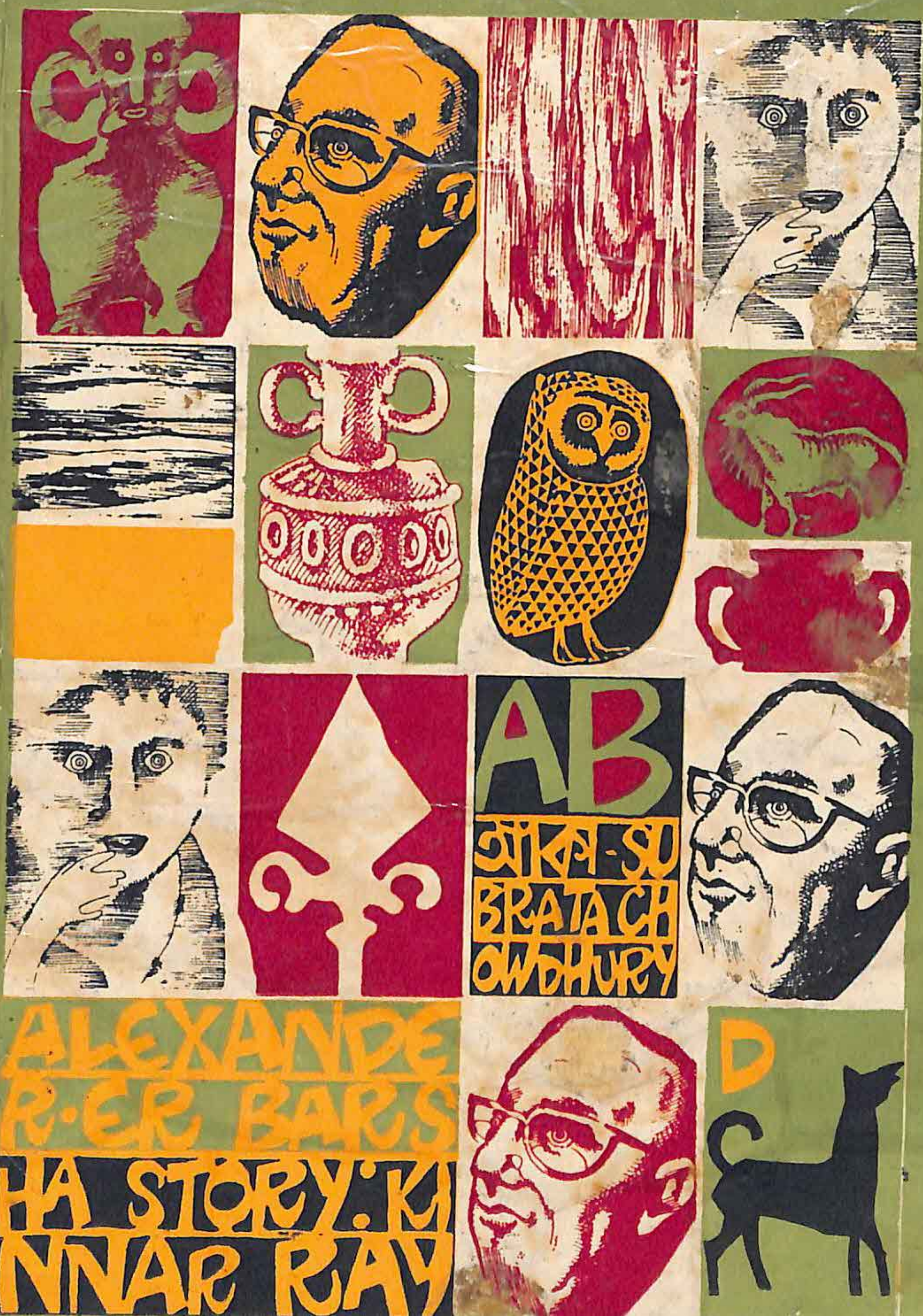
আলেকজাণ্ডারের বর্শা

কিন্নর রায়



আলেকজাণ্ডারের বর্শা

আলেকজাণ্ডারের

বর্শা



কিন্নর রায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা, ১৩৯২
জানুয়ারী, ১৯৮৬

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ও ভেতরের ছবি
সুব্রত চৌধুরী

মুদ্রাকর
পঞ্চানন জানা
জানা প্রিন্টিং কনসার্ন
৪০/১বি, শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কলিকাতা ৭০০০১২

দাম : ৮· টাকা

শ্রীমতী রেণু ভট্টাচার্য
শ্রীমতী উষারাণী ভট্টাচার্য
শ্রীমতী কিরণপ্রভা ভট্টাচার্য
শ্রীমতী আশালতা ভট্টাচার্য
শ্রীমতী রেণুকা রায়
শ্রীমতী নমিতা ভট্টাচার্য
শ্রীমতী স্বপ্না রায়

যাঁরা আমার ছবির মাকে
বারবার মনে করিয়ে দেন

এই লেখকের

কাছেই নরক

শুধু বাঁশী শুনেছি (যন্ত্রস্থ)

রথযাত্রা (,,)

আলেকজাণ্ডারের বর্শা

'খ্যাস' করে একটা অদ্ভুত শব্দের সঙ্গে সঙ্গে দেশলাই কাঠি জ্বলে উঠল।

পাখাঅলা দেবদূতের মাথায় বসানো মোমবাতির মুখ ধরে উঠতেই নরম হলুদ আলোয় ভরে উঠেছে ঘর। কতগুলো কাঁপা কাঁপা ভুতুড়ে ছায়া দেয়াল জুড়ে। গা-টা কেমন যেন ছমছম করে উঠল পিপুলের। এখানে বোধহয় কলকাতার মতো লোডশেডিং হয় না, মনে হয় ফিউজই হয়ে গেছে সমস্ত এলাকা।

মেজোমামার হাতে এখন সেই ব্রোঞ্জের দেবদূত। মোমের নরম নরম আর কাঁপা আলোয় মেজোমামার চেহারাও কেমন যেন আবছা —ভৌতিক হয়ে উঠেছে।

ফিকে আলোয় মেজোমামাকে একবার দেখে নেয় পিপুল। চাঁদি জোড়া চকচকে টাক। কাঁচাপাকা ঢেউ খেলানো চুল নেমেছে ঘাড় অব্দি। দেখে বোঝা যায় এককালে মাথা ভরা কোঁকড়া চুল ছিল। ফ্রেঞ্চকাট ছাঁটা দাড়ি-গোঁফ থুতনিতে জমানো। বেশির ভাগই পেকে গেছে। মাঝে মাঝে কালো রঙের দু-একটা চুল উঁচিয়ে থাকে। এই দাড়ি-গোঁফ বড্ড শখের মেজোমামার। এখানে এসে রোজ সকালে ফ্রিহ্যাণ্ড একসারসাইজের পর আয়েশ করে আয়নার সামনে বসে বিলিতি ছোট কাঁচি দিয়ে দাড়ি-গোঁফ ছাঁটতে দেখেছে পিপুল। পাশে থাকে পাতলা ক্ষুর। শোন্না। উঁচিয়ে থাকা বেয়াড়া চুল তোলার জন্যে। মুখ ভরাট গোলগাল। ডান নাকের পাশে একটা বিশাল আঁচিল মুখখানাকে আরও গম্ভীর করে তুলেছে। সাবেকি আমলের রুপোর ফ্রেমের সামান্য ঢিলে চশমা নাকের ওপর। গোল

ফ্রেম, ছোটো। মাঝে মাঝে বিচিত্র মুখ করে নাক কুঁচকে চশমা ওপরে ঠেলে মেজোমামা। দেখে ভারি হাসি পায় পিপুলের।

মেজোমামার বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়েছে সবে। আঁটসাঁট পেটানো বলিষ্ঠ চেহারা। মাথায় পাঁচ ফুট ন ইঞ্চি। মেজোমামার পরনে এখন ঢিলে জিন্‌সের সার্ট-প্যাণ্ট, একই রঙের—মেরুন।

সমস্ত ঘর জুড়েই কেমন একটা পুরনো গন্ধ। বলতে গেলে ঘরটা পুরনো জিনিসের গুদোম বিশেষ—তবে ছিমছাম সাজানো। সমস্ত ঘরের বড় আলমারি দেরাজ টেবিল জুড়ে রয়েছে রাজ্যের মান্ধাতা আমলের জিনিসপত্র। অস্ত্রশস্ত্র, দলিল-দস্তাবেজ, হাতে লেখা পুঁথি, ভাঙা মন্দিরের চুড়ো, টালি। এক কথায় যেন একটা আস্ত মিউজিয়াম। শুধু মূর্তির ঘর আলাদা, সেখানে শুধুই প্রাচীন মূর্তিরা।

নিজের মনেই অদ্ভুত গোঁ নিয়ে আত্মীয়-পরিজন শূন্য হয়ে পড়ে আছে মানুষটা এই বিদেশে। এটাই একমাত্র সখ-সাধনা। বিয়ে-থা করে নি মেজোমামা। প্রথম যৌবনে বৃটিশ রয়্যাল আর্মির হয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরেছে। তারপর ফিরে এসে এই নির্জনে বাড়ি কিনে বসেছে।

মায়ের কাছে মেজোমামা সম্বন্ধে নানা কথা শুনেছে পিপুল। ছবিও দেখেছে মায়ের এ্যালবামে। অবশ্য এ ছবির সঙ্গে সে ছবির একটুও মিল নেই। মাদের দেশের গাঁয়ে নাকি একবার যাত্রা হয়েছিল। মেজোমামা করেছিল রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ-এর পার্ট। সেই ইন্দ্রজিৎ-এর পোশাক-আশাক পরা ছবি আছে মেজোমামার। পেল্লায় গোঁফ, মাথায় ঝকঝকে মুকুট। ঝোল্লাঝাল্লা জামা-কাপড়, হাতে তীর-ধনুক।

যে ফটো তুলেছিল বোঝা যায় তার হাত খুব পাকা ছিল না। বোধহয় নড়েও গেছিল সামান্য। তবুও সেই বিশাল একজোড়া ঝকঝকে চোখের কথা পিপুল ভুলতে পারে না আজও। সেই চোখ—মেজোমামার চোখের দিকে একবার তাকালো পিপুল। এই

কম আলোয় চাঁদির চশমার ভেতর দিয়ে এখনও তেমনি ঝকঝকে।

ঘরে খুব গরম আর গুমো গন্ধ। ব্রোঞ্জের দেবদূত হাতে তুলে নিল মেজোমামা তারপর ঘুরে ঘুরে দেখাতে লাগল তার সারা জীবনের সংগ্রহ। বড় বড় অয়েল পেইন্টিং, নানারকম মাটি-পাথর-কাঠ ও ধাতুর পাত্র দলিলপত্র পাণ্ডুলিপি। সবই জীবন্ত ইতিহাস।

অসীম উৎসাহে মেজোমামা বলে চলে এদের গুণাগুণ, আর কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে এই সমস্ত জিনিস। সব জিনিসের তলাতেই তাদের পুরো পরিচয় লেখা আছে। শুনতে শুনতে ইতিহাসের বিভিন্ন পাতায় ঘুরে আসছিল পিপুলের মন। 'গান্ধার' ঘরানার বুদ্ধমূর্তির সঙ্গে সাধারণ বুদ্ধমূর্তির কি পার্থক্য, তা খুব মন দিয়ে বোঝাচ্ছিল মেজোমামা।

পিপুল শুনতে শুনতে মাঝে মাঝেই অন্য কথা ভাবছে। আর থেকে থেকে প্যান্টের পকেট হাতড়ে ফাইভস্টার চকোলেট বের করে চিবুচ্ছে।

মেজোমামা ছোটবেলা থেকেই কেমন যেন রহস্যময় নাম। মায়ের কাছে শোনা, বাড়ি থেকে হঠাৎই উধাও হয়ে গেছিল ছেলেবেলায় কাউকে কিছু না বলে। তখন ডাঁটো জোয়ান। হঠাৎ চিঠি এলো বিদেশের ছাপ মেরে। লড়াইয়ের ময়দান থেকে চিঠি এসেছে মেজো-মামার। কাউকে কিছু না বলে চুপি চুপি যোগ দিয়েছে বৃটিশ ফৌজে।

মায়ের ওপর বরাবরই একটা কেমন যেন গোপন টান ছিল মেজোমামার। ছিল বোধহয় মারও। মায়ের পেটের আর পাঁচটা ভাইবোনের মতো মেজোমামাকে কোনোদিন দূর ছাই করে নি মা, যেমন অনেকে করে। বরঞ্চ আদর দিয়েছে, ভালোবেসেছে।

চিঠি আসত মেজোমামার, মা বলেছে। ন্যাড়া রাজা বা রানীর ছাপঅলা চিঠি। কখনও কখনও বা আসত বিলিতি রুমাল সাবান বা

আর কিছু টুকিটাকি জিনিস। বাইরে থেকে একটা গ্রুপ ফটোও পাঠিয়েছিল মেজোমামা, সৈনিকের পোশাকে। সেই ছবিটা যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছে মা। তাই জ্ঞান হয়ে অব্দি ওই রাবণের ছেলে মেঘনাদ—ইন্দ্রজিৎ-এর পোশাকেই দেখে আসছে পিপুল মেজোমামাকে।

তারপর বহুদিন কোনো খবর নেই। যুদ্ধটুদ্ধ কবে কোথায় মিটে গেছে।

পিপুল জন্মেছে অনেক পরে। ১৯৬০ সালে। আর এখন ১৯৭৭, পিপুলের বয়েস সতের প্রায়।

কদিন আগে এক শীতের দুপুরে মা বারান্দায় বসে উল বুনছে। আর পিপুল মুগ্ধচোখে চেয়ে আছে সেই জোড়া কাঁটা আর উলের দিকে। লাল হলুদে কেমন কতকগুলো অদ্ভুত ঘোড়সওয়ার আঁকা হয়ে যাচ্ছে তার সোয়েটারের ওপর। স্কুল-টুল সব ছুটি। রেজাল্টও বেরিয়ে গেছে। উফ্, কবে যে শেষ হবে সোয়েটারটা, আর পিপুল সেটা পরে ঘুরে বেড়াবে শহরময়। বোনটিরটা কবে হয়ে গেছে। কাকুর সঙ্গে বোনটিও এখন বেড়াতে গেছে দিল্লি আগ্রা এলাহাবাদ। প্রতীক্ষায় আছে পিপুল কবে আসবে বোনটির চিঠি।

মাথায় টুপিঅলা ডাকপিওন চক্রবর্তীদাকে দেখা গেল মোড়ের মাথায়। দোতলার এই বারান্দায় বসলে একদম সোজা সাফ সুতরো দেখা যায় ওই মোড় অব্দি। হাতে একগাদা চিঠি নিয়ে হাঁটে চক্রবর্তীদা। ঘুরতে ঘুরতে এসে ওদের বাড়ির সামনে এসে থমকায়। নীল রঙের চিঠির বাক্সর মধ্যে গলিয়ে দেয় কিছু।

পিপুল দৌড়ে নীচে। নিশ্চয় বোনটি—মিঠিমণির চিঠি। কত কি দেখছে মিঠিমণি কাকু কাকিমার সঙ্গে। ওদের একমাত্র মেয়ে মিঠিমণি। নিচে গিয়ে হাত বাড়িয়ে চিঠির বাক্স খোলে পিপুল। নাহ্, এতো মিঠিমণির চিঠি নয়। নীলরঙের খামের ওপর গোটা গোটা অক্ষরে তো লেখা নেই দাদামণি C/o প্রতুল গাঙ্গুলি···। নিজের হাতে



যাবার আগে মিঠিমণিকে নীল খাম কিনে দিয়েছে পিপুল। নীল রঙ ওর সব থেকে বেশি পছন্দ।

কোথায় নীল খাম, কোথায় কি। একটা ধূসর রঙের বিশাল খাম। বেশ ভারী, তার ওপর ডট পেনের সবুজ কালির পাকানো লেখা ইংরেজিতে মা আর তলায় বাবার নাম। বাড়ির ঠিকানা। তবে কি বাবার অফিসের চিঠি, শেয়ারের কাগজপত্র না, অন্য কিছু!

মায়ের কাছে পা টিপে টিপে এলো পিপুল। কাঁটা-উল থেকে চোখ না তুলেই বলল মা, কি লিখেছে মিঠিমণি জোরে পড়।

তোমার চিঠি। মিঠিমণির নয়।

আমার! কেমন যেন আকাশ থেকে পড়ে মা। তারপর কাঁটা-উল থেকে চোখ তুলে হাত বাড়িয়ে নেয় ধূসর খামখানা। চোখে কালো ফ্রেমের পুরু চশমা ঠিক করতে করতে কপাল সামান্য কুঁচকে বার বার চোখ বোলায় চিঠির ওপর। সামান্য কিছুক্ষণ ঠিকানা লেখা জায়গায় চোখ রেখে হঠাৎ মা আবেগে চিৎকার করে ওঠে, মেজদা, মেজদা চিঠি দিয়েছে!

কেমন যেন অবাক হয়ে যায় পিপুল। মার মুখে একরাশ খুশির আলো। যেমন ভোরের আকাশ!

কে মেজদা! প্রশ্ন এলো পিপুলের মুখে।

ওরে, তোর সেই মেজোমামা চিঠি দিয়েছে। অনেকদিন বাদে। উফ্, কি যে আনন্দ হচ্ছে!

মেজোমামা! পিপুলের চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ের বর্ণনা, আর মেজোমামার সেই যাত্রার ইন্দ্রজিৎ সাজা ছবি। কোনো কথা না বলে পিপুল পা চালিয়ে দেয় পড়ার ঘরে হাড়ের তৈরি পাতলা ছুরি নিয়ে আসতে—চিঠির মুখ কাটার জন্যে।

পড়ার ঘরে ঢুকেই পিপুলের চোখ পড়ল মাছের এ্যাকোরিয়ামের ওপর। কালকে হাতিবাগানের হাট থেকে কেনা এ্যালবিনো ল্যাকটেলের ছেলে মাছটা কোণের দিকে অক্সিজেন গাছের তলায়

কেমন নেতিয়ে পড়ে। এ্যাকোরিয়ামের গায়ে টোকা দিতেই দিব্যি নড়েচড়ে উঠল। লাইট জ্বেলে দিয়ে ভালো করে দেখল পিপুল। মাছটা উঠে একটু বুড়বুড়ি কেটে আস্তে আস্তে ঠোক্কর দিতে লাগল কেঁচোর টিউবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে এ্যাকোরিয়ামের আলো নিভিয়ে দিল। তারপর ড্রয়ার খুলে বার করতে গেল হাড়ের ছুরিটা। নাহ্, ছুরিটা এর মধ্যে নেই। আতশ কাঁচ, জ্যামিতি বাক্স, রঙের বাক্স, তুলি, কিছুটা পাকানো তার, স্ট্যাম্পের ফার্স্ট-ডে কভারের বাণ্ডিল সব আছে ড্রয়ারের ভেতর। নেই কেবল সেই হাড়ের ছুরি।

কাজের সময় কোনো জিনিসই পাওয়া যায় না। রাগে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। এদিকে মেজমামার চিঠি, আর পিপুল কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না ছুরি, যা দিয়ে খামের মুখ কাটা যায়।

শেষমেশ পেন্সিল কাটার ছোট্ট ছুরি ড্রয়ার হাতড়ে বের করে পিপুল। তারপর নিয়ে গটগট করে পা বাড়ায় পড়ার ঘরের দিকে

বাইরের বারান্দায় এসে দেখল এবড়ো খেবড়ো করে খামের মুখ ছেঁড়া, মা খুউব মন দিয়ে পড়ে চলেছে চিঠি। মায়ের ঘাড়ের পাশ দিয়ে এসে চোখ ভাসায়। বিশাল চিঠি, সুতো দিয়ে পাতাগুলো একটা আর একটার সঙ্গে সেলাই করা। বহুদিনের পুরনো পাতা। কেমন যেন হলদে হয়ে আসা। বিবর্ণ। একটা গুমো গন্ধ বারবার পাতাগুলো থেকে ঘুরে ঘুরে আসে। গন্ধটা নাকে এসে পৌঁছয় পিপুলের। পিঁপড়ের মতো ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর। শাদা পাতার ওপর লাইনবন্দী মোটামুটি সোজা লাইন। অক্ষরগুলো ছোট আর গোলগোল।



মা বড্ড তাড়াতাড়ি পড়ে।

এর মধ্যে পিপুল কয়েকটা শব্দ পড়ে নেয়—'কোণারক,' 'বাংলো', 'গবেষণা' ইত্যাদি। মাঝে মাঝে কয়েকটা ইংরেজি শব্দও রয়েছে। মন দিয়ে প্রায় এক নিশ্বাসে চিঠি শেষ করে মা। পুরনো কাগজে লেখা চিঠির বাণ্ডিল ছুটন্ত ঘোড়সওয়ার আঁকা সোয়েটারের ওপরই রাখে মা। নীল জমির ওপর হলুদ ঘোড়সওয়ার। ঝকঝক করে। চকচক করে মার মুখ—খুশিতে। মুগ্ধচোখে তাকিয়ে থাকে পিপুল মার মুখের দিকে।

অনেকক্ষণ ধরে আনমনা বসে থাকে মা। উলের গোলার ওপর একটা চড়াই এসে দিয়ে যায় ঠুকরে। বেলা পড়ে আসে। কেমন হাওয়া দেয় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা।

কৌতূহল চাপতে না পেরে আদুরে গলায় জিজ্ঞেস করে পিপুল, কি লিখেছে মেজোমামা ?

মা কিছুক্ষণ চুপ। তারপর জবাব আসে, মেজদা ওর ওখানে যেতে লিখেছে।

আবার সব চুপচাপ। ওখানে এই শব্দটা কেমন ধাঁধার মতো ঠেকে পিপুলের কাছে। হলুদ ঘোড়সওয়ারেরা নীল মাঠের ওপর দৌড়োয়। মাথার মধ্যে কেমন পাক দেয় পিপুলের। কি যে হেঁয়ালি করে মা!

অনেক ঢোঁক টোঁক গিলে আবার প্রশ্ন করে পিপুল, মেজোমামা এখন কোথায় মা? এবার খুউব তাড়াতাড়ি জবাব আসে—কোণারকে, কোণারক যাব আমরা।

একথা বুকের মধ্যে সানাই বাজায় পিপুলের। সাতটা সুর খেলা করে একসঙ্গে। অনেকদিন আগে, সেই ছেলেবেলায় ইতিহাস বইতে দেখা কোণারক সূর্য-মন্দিরের ছবি ভেসে আসে পিপুলের চোখের সামনে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে থাকতে ইচ্ছে করে। জোরালো হাওয়া এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় মুখ ছেঁড়া ধূসর খাম বারান্দার এক কোণে। চিঠির বাণ্ডিলের ভেতর হাওয়া নড়াচড়া করে শব্দ তোলে, ফরফর ফরফর।

ছুটি কিছুতেই যেন কাটতে চাইছিল না। রোজ সকাল থেকে সন্ধ্যে অব্দি কেমন যেন একই মনে হোতো। বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি খুব—এক একটা দিন। একেবারে নুন ছাড়া আলুকাবলি।

মেজদা লিখেছে সবাইকে নিয়ে কোণারক যেতে। কোণারকের সূর্য-মন্দির থেকে মাইল দুয়েক দূরে একটা পুরনো বাংলো কিনেছে মেজদা। দোতলা বাড়ি, অনেকগুলো ঘর। দোতলার চিলে-কোঠাতেও ঘর আছে একটা। নীচের তলায় শুধু ঠাকুর চাকর মালি আর দারোয়ানরা থাকে। বাড়ি থেকেই স্পষ্ট চোখে পড়ে মন্দিরের চুড়ো। বাগান আছে বাড়ির সামনে। সেখানে নিজের হাতে দেশ-বিদেশের গাছ এনে লাগিয়েছে মেজদা। দেশের বাড়ির মতো পাঁচ রকম রঙের জবা ফুলই লাগিয়েছে। বড্ড ফুলের নেশা ওর। একটা বিশাল লাইব্রেরি আর মিউজিয়ামও বানিয়েছে সেই বাড়ির দোতলা জুড়ে। এই রোগটা ওর পুরনো। ওতেই তো

খেলো ওকে। সারাজীবন সংসার করল না। বাউণ্ডুলে হয়েই রইল।

ছেলেবেলা থেকেই কুমোরে পোকার বাসা, বাবুই পাখির বাসা, মৌচাকের টুকরো, কোত্থেকে কোত্থেকে যে যোগাড় করে আনত। কাঁচের শিশির ভেতর গাছের শিশির পাতা দিয়ে তার মধ্যে ছেড়ে রাখত শুঁয়োপোকা। লক্ষ্য রাখত কি ভাবে গুটি হয়। গুটি কেটে বেরোয় প্রজাপতি। অবাক হয়ে আমরাও দেখেছি ছোটবেলা। ফুটো করা ন্যাকড়া দিয়ে আটকানো শিশির ভেতর কেমন করে বদকুচ্ছিৎ দেখতে শুঁয়োপোকা গুটলি মেরে গুটি পাকাত। তারপর কয়েকদিন বাদে দিব্যি ওর মধ্যে ওড়াউড়ি করত চিত্তির বিত্তির প্রজাপতি। এমনি কত কি।

মাটির ভাঁড়ে কাদার ভেতর থাকত গা গাদাগাদি করা কেঁচো, —কিলবিল করত দিনরাত। ছোটবড় জল দেয়া কাঁচের বোয়ামে শামুক, খলসে মাছ, কাঁকড়া। মাটির টবে লজ্জাবতী লতা, নানা রকমের ফণীমনসা। এখান ওখান থেকে আনা রকমারি পাথর থাকত সাজানো।

এসব নিয়ে রাতদিন নাড়াঘাঁটা করত মেজদা। চিলেকোঠার খুপরির মধ্যে ছিল ওর এই সব সম্পত্তি। খেলাধুলো ছাড়া অনেকটা সময়ই কাটাতো চিলেকোঠার ওই ঘরে। তখনও মাথায় যাত্রার নেশা ঢোকে নি। মাঝে মাঝে ঢুকে পড়তুম আমরাও ওখানে। পুলিশি মেজাজ নিয়ে বেশির ভাগ দিনই ও তাড়া লাগাত সবাইকে। কেবল আমাকেই বিশেষ কিছু বলত না। বরঞ্চ এটা ওটা করে দিতে বলত। গুছিয়ে রাখতে বলত হয়ত কোনো কিছু। মাঝে মাঝে গুরুগম্ভীর গলায় কি সব বোঝাত আমায়। একটা ডিমের মতো আতশ কাঁচ ছিল ওর। তখন অত বুঝতুম না। সেই বড় আতশ কাঁচটা দিয়ে আমাকে মাঝে মাঝে দেখাত গাছের পাতা, মাছের পাখনা। নিজে দেখত আর খাতায় টুকত। যখন ও বাড়ি থাকত

না, দরজায় বিশাল তালা ঝুলত। চিলেকোঠার দরজাটা এতো পলকা যে জোরে হাওয়া দিলেই হয়ত ভেঙে পড়ত এমন অবস্থা। অত বিশাল তালা ঝুলত তার শেকলের সঙ্গে। এখন ভাবলে কেমন হাসি পায়। যাই হোক, সেই চিলেকোঠার কেমন একটা অদ্ভুত রহস্য ছিল যেন তখন।

ছোটবেলার কথা বলতে বলতে অদ্ভুত উজ্জ্বল হয়েছে মার মুখ। কেমন যেন বাচ্চা বাচ্চা মনে হচ্ছে মাকে। চশমা খুলে একবার মুছে নিল। বেলা শেষের সোনা রোদ আছড়ে পড়েছে মার বুকে, মুখে গলায় কোলে। আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে হলুদ ঘোড়সওয়ারদের। মার চোখ চকচক করছে।

আদুরে গলায় মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল পিপুল, আমরা কোণারক যাব মা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

মা উঠে গিয়ে ধূসর রঙের খাম কুড়িয়ে আনলো বারান্দার কোণ থেকে। খামটা হাওয়ায় উড়ে গিয়ে বারান্দার শিকের সঙ্গে আটকে ছিল।

উলের গোলা গুছিয়ে তাদের পেটের ভেতর বোনার কাঁটা গুঁজতে গুঁজতে বলে উঠল মা—যাবইতো। মেজদা ডেকেছে, আর আমি না গিয়ে পারি!

পিপুলের বুকের ভেতর একটা সাতরঙ' পাখি ওড়াউড়ি শুরু করে দিল। কোণারক—সূর্যমন্দির।

পুরীতেও যাব আমরা। পুরী ভুবনেশ্বর হয়ে কোণারকে যাব। কতদিন পুরী যাই নি। সমুদ্র দেখতে যা ভালো লাগে…।

মার কথা শেষ হয় না। রাস্তার ওপর রোদ কমে এসেছে। হলুদ উইকেট লাল বল আর শাদা ব্যাট হাতে ওরা হাজির—মিতুন, জয়, ইন্দ্র, মৈনাক, শাওন, বুদ্ধ, বাবনা আর বাবুইরা। কথায় কথায়

খেলার কথা ভুলেই গেছিল পিপুল। পরশু ম্যাচ ব্যানার্জি পাড়ার সঙ্গে। আজ আর কাল, টানা দুটো দিন প্র্যাকটিশ করাবে বুল্লিদা। ভালো করে খেলতেই হবে।

আর সময় নেই। চটপট তৈরি হয়ে নিল পিপুল। শাদা প্যান্ট সার্ট। শাদা কেডস্, আর নীল বর্ডার দেয়া হাত কাটা স্পোর্টর্স সোয়েটার।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নেমে এসে মৈনাকের হাত থেকে ব্যাটটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পিপুল বলল, স্কোয়ার কাট এইভাবে মারতে হয়। ক্রিকেটের ওপর একটা বই এনেছে বাবা কাল। তাতেই ছবি দেখে শিখেছি। কাল তোরা যেটা মারছিলি, সেটা ভুল। আর অফ্‌স্টাম্পের বাইরের বল কখনো বলের লাইনে পা মাথা ব্যাট না এনে খেলবি না। এক লাইনে ব্যাট প্যাড মাথা না আনলেই ক্যাচ উঠবে নির্ঘাৎ। ব্যস, একেবারে সোজা উইকেট কিপারের হাতে, কট বিহাইণ্ড। কথাটা শেষ করে বিজ্ঞের মতন মুখ করল পিপুল। ওরা সবাই অবাক হয়ে শুনছিল ওর কথাই।

পায়ে পায়ে সবাই মাঠে।

সবুজ মাঠের একদিকে সূর্য সামান্য কাত হয়ে গেছে। বুল্লিদা একা একাই গোটা মাঠ দৌড়ে দৌড়ে গোল করে পাক মারছিলেন।

ওদের দেখে দৌড় থামিয়ে সবাইকে পিটি করতে বললেন বুল্লিদা। চল্লিশ পার হয়ে এসেও বুল্লিদার চেহারা বেশ শক্ত সমর্থ। মাথা বোঝাই কদম ছাঁট কাঁচা-পাকা চুল। দাড়ি-গোঁফ কামানো প্লেন মুখে দু-একটা ভাঁজ পড়ব পড়ব করছে। লম্বায় পাক্কা চার ফুট ন ইঞ্চি। বাংলার হয়ে রণজি খেলেছেন। দিলীপ ট্রফিও খেলেছেন পূর্বাঞ্চলের পক্ষে। এখনো ভালো ব্যাট করেন। পিপুল তো সেইরকমই বিশ্বাস করে।

বুল্লিদা ওদের সবাইকে লাইন বেঁধে দাঁড় করিয়ে পিটি করিয়ে নিলেন। গাটা বেশ গরম হয়ে গেলে শুরু হল প্র্যাকটিশ।

আশেপাশের পাড়া থেকে আরও কয়েকজন ছেলে আসে বুল্লিদার এখানে খেলা শেখার জন্যে।

ব্যাটবলের লড়াই শুরু হল একটু বাদেই। হলুদ তিনকাঠি—উইকেট আগলাচ্ছিল মৈনাক। গোলার মতন দৌড়ে আসছিল লাল বল। ইন্দ্র বেশ জোরেই বল করে! মাঝে মাঝে বাতাসে বাঁক নেওয়ায় বলকে। ইন্দ্রকে তাই আদর করে মাঠের ছেলেরা ডাকে লিলি।

এই মাঠে এলে বুল্লিদার আড়ালে ওরা নিজেরাই নিজেদের একটা করে নাম নিয়েছে। মৈনাক নিজেকে বলে কনরাড হাণ্ট, জয় নিজের নাম নিয়েছে ইয়ান চ্যাপেল। বুদ্ধ বাবলা দু'ভাই। বাবলা বড়, বুদ্ধ ছোট। দুজনেই ভালো বল করে। চেহারার মিল না থাকলেও ওরা নিজেদের নাম বলে এরিক বেডসার আর এলেক বেডসার। দারুণ চেহারার মিল ছিল এই দুই ইংল্যাণ্ডের খেলোয়াড়ের। এঁরাও ছিলেন দুই ভাই। একজনের আউট অন্যজনের ঘাড়েও পড়েছে চেহারার মিলের জন্যে। এসব খবর ক্রিকেটের বইতেই পড়েছে পিপুল। শাওন নিজেকে বলে বিশ্বনাথ। আর মিতুন বলে নিজেকে গাভাসকার।

পিপুল নিজেকে সোবার্স ভেবে মনে মনে আনন্দ পায়। ছবিতে দেখা সোবার্সের ঝলমলে চেহারা চোখের সামনে ভাসে। পিপুলের দুঃখ হয় ও সোবার্সের মতো বাঁ হাতে ব্যাট করতে পারে না।

পিপুল ফিল্ডিং করছিল থার্ড শ্লিপে। তিনটে শ্লিপ একটা গালি নিয়েছে ইন্দ্র।

হাউজ দ্যাট—

সমস্ত মাঠ কেঁপে উঠল। একটু খুচ্ শব্দ। মৈনাকের ব্যাট ছোঁয়া বল পিপুলের হাতের মুঠোয়। অবিশ্বাস্য ক্যাচ নিল পিপুল। শরীরটাকে ধনুকের মতো একদিকে বাঁকিয়ে সম্পূর্ণ উল্টোদিকে ঝাঁপিয়ে পড়ে ক্যাচ নিয়েছে।

দৌড়ে এলো বুল্লিদা। জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিল পিপুলকে।

মাটি থেকে একটু ওপরে তুলে ঝাঁকি দিতে দিতে বলেছে, সাবাস! এরকম খেললে পরশু নির্ঘাৎ…। আবেগে গলা বুজে এসেছে বুল্লিদার। মৈনাক, ইন্দ্র মাঠের অন্যান্য সকলে পাথরের মতো চুপ।

সেদিনের মতো প্র্যাকটিশের সেখানেই ইতি। উইকেট তুলে ব্যাট বল হাতে ওরা সবাই বাড়ির দিকে পা বাড়ায়।

সমস্ত রাস্তা স্বপ্ন দেখে পিপুল, পরশু দিন সারা মাঠ জুড়ে থাকবে কেবল একটি নাম—পিপুল। ব্যাটে বলে ফিল্ডিং-এ সোবার্সের মতোই ও উজ্জ্বল করবে বুল্লিদার মুখ। বাঁকের মুখে মাঠের ওপর দিয়ে শর্টকাটে বেরিয়ে গেল ওরা। একা একা বাকি রাস্তাটুকু হেঁটে এলো পিপুল! তখন তার সারা শরীর জুড়ে বুল্লিদার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ। চোখে রঙিন রামধনুর প্রলেপ। পরশু দিন ভালো খেলতেই হবে।

সন্ধ্যে ঘন হয়ে এসেছে। ঠাণ্ডা লাগছে বেশ। পিপুল বাড়ি ঢুকে পড়ল। দাঁড়াল কলঘরের সামনে এসে।

মা এখন পুজোর ঘরেই হবে। জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে, হাত পা-ধুয়ে তবে পিপুল যাবে ওপরে। বাথরুমে ঢুকে পিপুল জামা-প্যাণ্ট ছেড়ে হাত মুখ ধুলো। তারপর গামছা পরে প্যাণ্ট জামা কেডস্ হাতে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল ওপরে।



দোতলার বারান্দায় এখন কম পাওয়ারের আলো। বাবা এখনও অফিস থেকে ফেরে নি। নিজের ঘরে আসতে আসতে একবার পুজোর ঘরে উঁকি দিল পিপুল।

হালকা নীল আলো জ্বলছে। বাবু হয়ে বসে মা। চোখ বোজা। কেমন যেন স্বপ্নের মতো মনে হয় মাকে। ধূপের মিষ্টি গন্ধ উড়ে আসছে। পিপুল বুক ভরে গন্ধ নেয়। ভেতর ভরে যায়।

নিজের ঘরে এসে টিউব লাইট জ্বাললো পিপুল। সুন্দর শাদা আলোয় ভর্তি হয়ে উঠল ঘর। আলনা থেকে জামা আর পাজামা টেনে নিল। তার ওপর মোটা সোয়েটার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ব্রাশ দিয়ে চুল পরিপাটি করে সাজিয়ে গুছিয়ে নিল। আলনার পাশ থেকে একটা হ্যাঙার টেনে নিয়ে তার ওপর প্যান্ট-সার্ট সোয়েটার পাট করে রাখল। কেড্স খাড়া করে রাখল জুতোর শেল্ফের ওপর। মোজা জোড়া দলা করা রইল কেড্সের ভেতরে।

এ্যাকোরিয়ামের ভেতরের আলো দিল জ্বেলে। শীতের দিনে বেশি করে গরম দেয়া দরকার মাছের জলে। এ্যালবিনো ল্যাকটেল

দিব্যি জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফাইটার চুপচাপ বসে আছে এক কোণায়, যেন কিচ্ছু জানে না। রঙ বদলাচ্ছে ফাইটার। লাল নীল লাল···।

মেথর মাছ লোচ্ জোড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘুরছে-ফিরছে, ময়লা খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ এ্যাকোরিয়ামের পাশে দাঁড়িয়ে বাবার আনা খেলার বইটা টেবিল থেকে নিল! বিছানায় আধশোয়া হয়ে শরীর এলিয়ে দিল পিপুল। পায়ের ওপর একটা পাতলা কম্বল দিল টেনে। সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থাকতে দেখলেই মা বকবে, পুরো শোয়ার উপায় নেই।

পাতায় পাতায় ছবি। কি করে বল ঘোরাতে ফেরাতে হয়—কব্জির মোচড়ে, আঙুলের টানে। অফব্রেক লেগব্রেক ইনস্যুইং আউট-স্যুইং কার্টার ইয়র্কার। ব্যাট করারও নানান কায়দা—হুক পুল ড্রাইভ লেগ কাট স্কোয়ার কাট কভার ড্রাইভ। কোথায় যেন হারিয়ে যায় পিপুল। মন বারে বারে চলে যায়, মেলবোর্ণ ওভাল পার্থ ব্রিসবেন গ্রীনপার্ক চীপক ইডেন আর ত্রিনিদাদের ঘাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে, আবার ফিরে আসে।

ক্রিকেটের রাজ্যে যিনি এখনও বিশাল নাম সেই ডব্লিউ. জি. গ্রেসের একটা মজাদার খবর আছে বইতে। বড্ড রসিক মানুষ ছিলেন গ্রেস সাহেব। একমুখ দাড়ি-গোঁফ ঢিলেঢালা পোশাক আর ঠোঁটের কোণে একটা দারুণ হাসি নিয়ে উনি মাঠে নামতেন। একবার হয়েছে কি ইংল্যাণ্ডের গ্লস্টারশায়ারের সঙ্গে সারের খেলা। গ্রেস তো সারের হয়ে ব্যাট করতে নামলেন। হঠাৎ তাঁর ব্যাটছোঁয়া বল কি করে যেন লাফিয়ে তাঁরই ঢোলা জামা টপকে একেবারে বুকের ভেতর গেল ঢুকে। ব্যস—গ্রেস সঙ্গে সঙ্গে দৌড় লাগালেন রানের জন্যে। এক দুই তিন···। রান বেড়েই চলে। কোথায় বল কোথায় কি! এক এক করে সাত সাতটা রান জমা পড়ল সারের খাতায়। গ্লস্টারশায়ারের খেলোয়াড়দের চোখ তো ট্যারা!

শেষমেশ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তাঁরা সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লেন গ্রেসের ওপর। ওই বিশাল চেহারাকে একজনের পক্ষে সামলানো সহজ ছিল না। অনেক ধস্তাধস্তির পর বল বেরুল গ্রেস সাহেবেরই জামার ভেতর থেকে। টানাটুনির জন্যে জামাও গেল ছিঁড়ে।

আর যায় কোথায়! গ্রেস সাহেব তো রেগে কাঁই। এত বড় আস্পদ্দা, তাঁর জামায় হাত। কিন্তু কি করা যাবে, এ ছাড়া তো আর কোনো উপায়ও ছিল না। সেই থেকে লেখাপড়া করে আইন করে দেয়া হল যে, ব্যাটসম্যানের ব্যাটে বল লেগে কোনো বল যদি তার পোশাকের ভেতর ঢুকে যায়, তাহলে কোনো রানই হবে না। তখন থেকেই চালু হল 'ডেডবল' আইন। এমনি কত ইতিহাস কত তথ্য। বেশ মজা লাগে পড়তে।

আজকের ক্রিকেট এসেছে অনেক পরে। 'টুল বল' 'ক্লাব বল'—তার পরে ক্রিকেট। ১৭৪৪ সালে দুটো কাঠি—উইকেট পুঁতে ক্রিকেট খেলা চালু হয়। জিনিসগুলো যত জানা যাচ্ছে মজা তত। পিপুলের মনে মনে দুষ্টুমির ইচ্ছে, কালকে ক্লাবে গিয়ে একটার পর একটা প্রশ্ন করবে সব্বাইকে। ওদের সকলের ভ্যাবা গঙ্গারাম মুখটা মনে করতে মনে মনে বেশ লাগছে।

১৮০৯ সালে একটা বেলের বদলে উইকেটের মাথায়···। বাকিটা পড়া হল না আর, লাইট নিভে গেল। লোডশেডিং মনে হচ্ছে। যদিও আজ দিন নয়, তবুও···।

পিপুল ওর মাথার বালিশের তলা হাতড়ে পেন্সিল টর্চ বের করে আনল। এটা ওর জন্মদিনে পাওয়া, বাবা দিয়েছে। টর্চ খুঁজতে গিয়ে বালিশের তলায় একটা ফাইভস্টার চকোলেটের আস্ত প্যাকেট পেল খুঁজে। টর্চের সরু আলো ফেলল টেবিলের ওপর। ছোট্ট একটা বাঁশের চোঙের ভেতর রয়েছে কতকগুলো কাগজের টুকরো। ওর মধ্যে থেকে একটা কাটা কাগজ খুলে এনে গুঁজে দিল বইয়ের

ভেতর। এটা ওর অনেকদিনের অভ্যেস। কাগজ দিয়ে আঙুল সরিয়ে নিল পিপুল যদ্দূর পড়া হয়েছে সেখান থেকে।

সারা ঘরজোড়া ঘুটঘুট্টি আঁধার, টর্চের আলো বেশি দূর পৌঁছয় না। কি যেন একটা ভারী জিনিস রাস্তার দিকের জানলা গলে ঘরের মেঝেয় লাফিয়ে পড়ল। একটা চাপা শব্দ শুনে চমকে উঠেই পিপুল দেখল, এক জোড়া চোখ হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে টেবিলের পাশে।

কি হবে ওখানে?

অন্ধকারে গায়ে কাঁটা দিল পিপুলের। ঘুঙুর নাকি!

ঘুঙুর পিপুলের পোষা স্প্যানিয়াল। গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। তাই বোধহয় অন্ধকারে মিশে রয়েছে। পিপুল আস্তে আস্তে ডাকল, ঘুঙুর—ঘুঙুর। নাহ্, কোনো সাড়াশব্দ নেই।

টর্চের আলো সোজাসুজি সেই চোখজোড়ার ওপর ফেলতেই ফ্যাস্ করে একটা রাগী ধমক দিয়ে বেরালটা চলে গেল বাইরে।

ওফ্! বেরাল। পিপুল নিজের মনেই বলল।

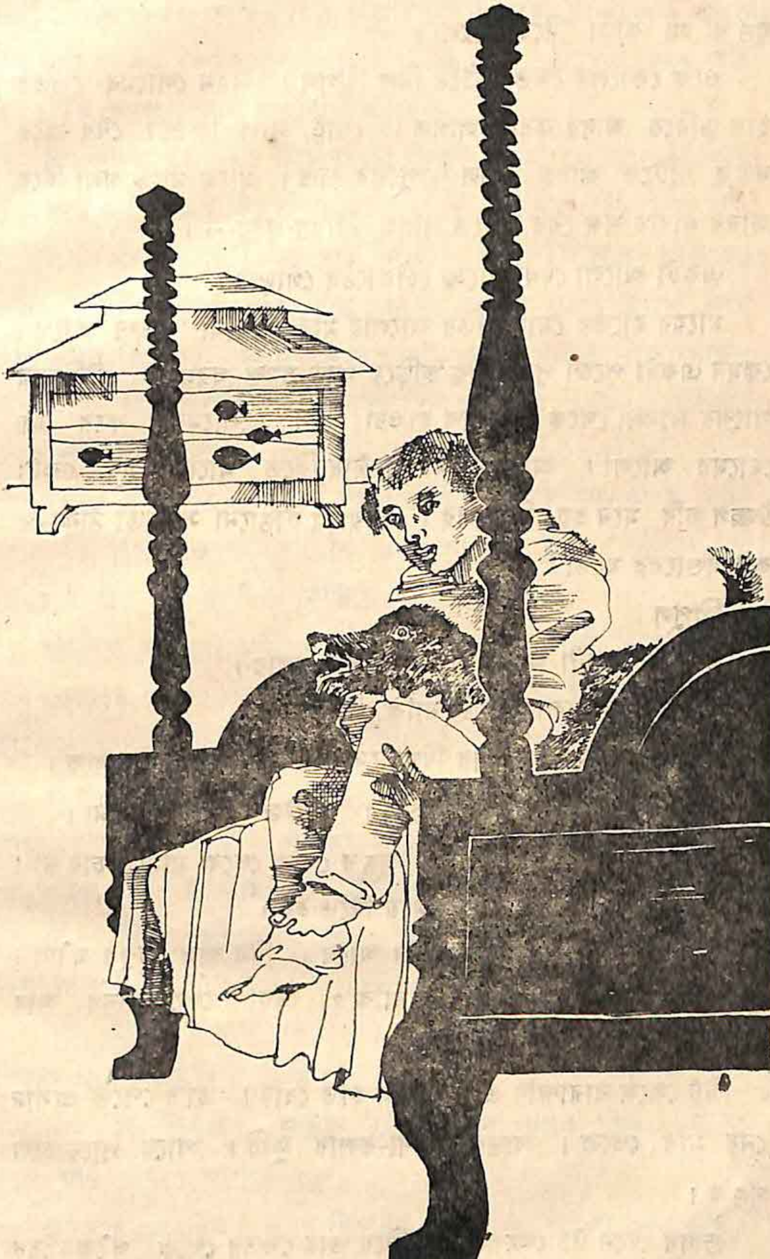
পায়ের তলায় গদীর মতো নরম মাংসের পুরু আস্তর থাকার জন্যে অনেক উঁচু থেকে পড়লেও এদের শরীরে কোনো চোট লাগে না। শব্দও হয় না। কার্নিশ বেয়ে জানলা গলে ঘরে এসেছিল শিকার খুঁজতে। ইঁদুর আরশোলা ধরার জন্যে।

কেমন বিরক্তি লাগে। কিন্তু ঘুঙুর কোথায় গেল? ঘরে ঢুকে অব্দি ওর কথা মনে ছিল না।

টর্চ জ্বেলে এদিক-ওদিক পিপুল খুঁজে বেড়ায় ঘুঙুরকে। জিভ দিয়ে চু-চু শব্দ করে ডাকে—ঘুঙ্র ঘুঙ্রু, আমার ঘুঙুর রানী।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নজরে পড়ে পায়ের কাছে রাখা লেপের গাদার ওপর। একটা কালো উলের বল হয়ে গুঁড়িসুঁড়ি মেরে গুট্‌লি পাকিয়ে শুয়ে আছে ঘুঙুর।

একটা দুষ্টুমি বুদ্ধি খেলে গেল পিপুলের মাথায়। ঘুঙুরের কানের



কাছে মুখ এনে একটা বিচ্ছিরি ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করল। চমকে উঠে ঘুঙুর গা ঝাড়া দিয়ে উঠলো।

ওকে কোলের ভেতর টেনে নিল পিপুল। নরম লোমের ভেতর হাত ডুবিয়ে আদর করতে লাগল। ছোট্ট লাল জিভটা বের করে ঘুঙুর চাটতে আরম্ভ করল পিপুলের হাত। মাঝে মাঝে গলা দিয়ে আদর খাবার শব্দ বের করতে লাগল—গরর্-গরর্…।

একটা আলো দেখা যাচ্ছে চৌকাঠের গোড়ায়। মা।

মায়ের হাতের মোমবাতির আলোয় মার মুখখানা দারুণ লাগে। কেমন একটা পুজো পুজো গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত ঘরময়। টেবিলের পাশের জানলা থেকে একরাশ হাওয়া এসে এলোমেলো করে দেয় মোমের আলো। আবছা আলো-আঁধারিতে মায়ের মুখ একটা উজ্জ্বল ছবি মনে হয় পিপুলের। দেয়ালে টাঙানো সরস্বতী ঠাকুরের ক্যালেণ্ডারের মতো।

পিপুল।

উঁ-উ। একটা আদুরে শব্দ পিপুলের গলায়।

লাইট নেভা, লোডশেডিং নাকি রে?

আজ তো দিন নয়। আর বিমানদের বাড়িতেও আলো জ্বলছে।

দেখ দেখি একবার মেন সুইচটা। ফিউজ হয়ে গেল কিনা।

পিপুল গা নাড়া দিয়ে ওঠে। ঘুঙুর কোল থেকে নামতে চায় না। একরকম জোর করেই ওকে নামিয়ে দিতে হয়।

নে পেসাদ খা। হাত ধুয়ে নে আগে। দিন রাত কুকুর ঘাঁটা। ঘুঙুর এতক্ষণ তোর কোলে ছিল নাকি? বিছানা পেলে বাবুর আর কিছু চাই না।

টর্চ জ্বেলে বারান্দায় এসে পিপুল হাত ধোয়। হাত পেতে প্রসাদ নেয় মার থেকে। বাতাসা শশা-কলার কুচি। পায়ে পায়ে চলে ঘুঙুর।

ড্রয়ার টেনে টর্চ জ্বেলে দেখে নিয়ে তার ভেতর থেকে খুঁজে বের

করে পিপুল ফিউজ তারের রিল, স্ক্রুড্রাইভার। ঘর থেকে এক হাতে টুল উঠিয়ে নিয়ে পাজামার পকেটে ফিউজ তারের বাণ্ডিল রেখে অন্য হাতে টর্চ জ্বেলে পিপুল বারান্দায় আসে।

টুল পেতে ওর ওপর উঠে দাঁড়ায় পিপুল। মা মোমবাতিটা ধরে উঁচু করে। দাঁতের ফাঁকে চুরুটের মতো পেন্সিল টর্চ চেপে ধরে পিপুল। ধুলো মাখা ফিউজ খুলে ফেলে। আলো ফেলে ফিউজের ওপর। সত্যি সত্যি কেটে গেছে তার। রিলের থেকে দাঁতে করে তার কাটে পিপুল। কথায় কথায় প্লাসটা আনার কথাই ভুলে গেছে। মাপ মতো তার কেটে নিয়ে ফিউজের ভেতর বসিয়ে দেয়। ফিউজটা ঠেলে ঢুকিয়ে দেয় ভেতর দিকে।

উজ্জ্বল আলোতে ভরে যায় সমস্ত বাড়ি। হঠাৎ অনেকক্ষণ বাদে জ্বলে ওঠা আলোকে অনেক বেশি জোরালো মনে হয়। পিপুল টুল থেকে নামে। মা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় মোমবাতি।

ঘুঙুরও খুশিতে নেচে ওঠে। পেছনের দুপায়ে ভর দিয়ে উঠতে চায় কোলের ভেতর। পিপুল ওকে কোলে নেয় না। আপন মনে হাঁটে। পেছন পেছন ঘুঙুর।

প্রবল খিদে পেয়েছে পিপুলের। সামনে প্লেট বোঝাই বিট-গাজরের তরকারি রুটি মা সাজিয়ে দিতেই হাতের কাজ শুরু হয়ে যায়।

এমন সময় ওর নাম ধরে কে যেন ডাকে। কান খাড়া করে পিপুল। মিঠুর গলা মনে হচ্ছে। আজ সন্ধ্যেবেলায় ওর আসার কথা ছিল মাছ দেখতে।

মিঠু এলো। সঙ্গে ওর দিদি। একসঙ্গে একই কোচিনে পড়ে পিপুল আর মিঠুর দিদি, বিবি।

দ্যাখ না পিপুল। ভাইয়া সন্ধ্যে থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছিল তোর মাছ দেখতে আসার জন্য।

ভালোই করেছিস। দ্যাখ মিঠু, কতো মাছ। ভালো করে দ্যাখ। পিপুল মিঠুর গাল টিপতে টিপতে বলে।

বিবি মিঠু দুজনেই মুগ্ধ চোখে দেখতে থাকে লাল-নীল মাছেদের সাঁতার।

বাবা অফিস থেকে ফেরার একটু বাদেই মা মেজোমামার চিঠির কথা বলল।

বাচ্চা ছেলের মতো অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে শুনল বাবা। তারপর হঠাৎ ছেলেমানুষের মতো হৈ-হৈ করে উঠল।

ল্যাজ-মুখ এক করে ঘুঙুর ঘুমুচ্ছিল। বাবার গলার শব্দে একটু কেঁপে উঠেই জেগে উঠল। তারপর কান গা ঝেড়ে নিয়ে গুট গুট করে পিপুলের কোলে এসে বসল।

মুহূর্তের মধ্যে ঠিক হয়ে গেল কোণারক যাবার কথা।

খেয়ে-দেয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাবা বলল, পিপুল, তুমি অবন ঠাকুরের কি কি বই পড়েছ? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে পিপুল উত্তর দিল—নালক, বুড়ো আংলা, রাজকাহিনী।

অবন ঠাকুরের 'গমনাগমন' বলে একটা অংশ আছে, আমার ঠিক মনে নেই কিসের ভেতর পড়েছিলুম। তবে তার মধ্যে বড্ড সুন্দর করে দেয়া আছে কোণার্ক যাবার বিবরণ। কোণারককে আগাগোড়া অবন ঠাকুর কোণার্ক বলে গেছেন। তাতে একটা লাইন আছে,··· পহর রাতি, পান বিঁড়িটি। পান বিঁড়িটি, পহর রাতি।

বাবার বড় মনে থেকে যায়। সেই কবে কোথায় কি পড়েছিল সব কথা মাথার ভেতর গিস গিস করে। প্রাচীন ইতিহাস পুরাণ আর সাহিত্য হলে তো কথাই নেই।

কোণারকের ইতিহাস বড় অদ্ভুত, রহস্যময়। বাবা শুরু করল। সারা ঘর জুড়ে নীল আলো। বাবা ইজিচেয়ারে আধশোয়া, হাতে সিগারেট পুড়ছে। মাও বসে মেঝেতে, পিপুলও। ঘুঙুর সঙ্গে সঙ্গে আছে। পিপুলের কোলের ভেতর শুয়ে আদুরে গরর্ গর্ শব্দ তুলেছে।

…পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক যে দিক দিয়েই তুমি দেখ না কেন, কোণারকের তুলনা নেই। উড়িষ্যার তালপাতার পুঁথি—মাদলা পঞ্জীতে অনেক বিবরণ আছে কোণারকের।

আমাদের পুরাণ বলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ষোলো হাজার রানী ছিল। শাম্ব ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের ছেলে। শ্রীকৃষ্ণের শাপে তাঁর কুষ্ঠ হলে চন্দ্রভাগা যেখানে সমুদ্রে মিশেছে, তার কাছে মৈত্রেয় বনে তিনি কঠোরভাবে সূর্যের তপস্যা শুরু করেন। সূর্যের কৃপায় তাঁর রোগ সেরে যায়। সুস্থ হওয়ার পর তিনি চন্দ্রভাগায় স্নান করেন। স্নান শেষে পাড়ের ওপর উঠতেই এক সুন্দর সূর্য মূর্তি চোখে পড়ে তাঁর। তিনি সেই মূর্তি এনে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করেন। মন্দির তৈরি করে দেন।

এ নিয়ে অবশ্য অন্য আরও মত আছে। মন্দির তৈরি, আর তার ইতিহাস এমন ঝামেলার না!

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে বাবা থামল। সিগারেটে একটা কষে টান দিল। মায়ের দিকে নজর করে দেখল পিপুল—মা ঘন ঘন হাতজোড় করছে। বোধহয় শ্রীকৃষ্ণ শাম্ব আর সূর্যদেব, তিনজনকেই।



একটু থেমে বাবা আবার শুরু করল, এবার শোনো ইতিহাস। উড়িষ্যার রাজা প্রথম নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই মন্দির তৈরি করান। গঙ্গবংশের এই রাজা যতদিন রাজত্ব করেছেন, ততদিন উড়িষ্যার ইতিহাস ছিল দারুণ গৌরবময়। সমস্ত উত্তর পশ্চিম ভারত ও বাংলাদেশ যখন মুসলমানদের দখলে চলে গেছে, ঠিক তখনই উড়িষ্যারাজ নরসিংহদেব সৈন্য-টৈন্য নিয়ে এগিয়ে আসেন।

ব্যাপারখানা বোঝ একবার। বাবা হঠাৎ কথার মোড় নিল। তারপরই আবার আগের কথার জের টেনে বলল, নরসিংহদেবের হাতে মুসলমানরা গো-হারান হেরে যায়। আর এর ফলে আরও দুশো বছর হিন্দু রাজত্ব টিকে গেল। অনেকে বলেন, কোণারকের সূর্য মন্দির রাজা নরসিংহদেবের জয়স্তম্ভ।

বিচিত্র ইতিহাস মন্দির তৈরির। যদিও সে এক গল্প। শোনা যায় বারো শ কারিগর বারো বছর ধরে এই মন্দির তৈরি করেন। সমস্ত রাজ্যের বারো বছরের আয় খরচ হয় এই মন্দিরের পেছনে।

বারো শ শিল্পীর প্রধান ছিলেন বিষ্ণু মহারাণা। তাঁর ছেলে

ধর্মপদ। ধর্মপদর একদম ছোটো বয়েসে বিষ্ণু মহারাণা গ্রাম ছেড়ে আসেন।

বারো শ সঙ্গী নিয়ে বিষ্ণু মহারাণা মহা ফাঁপরে পড়েছেন। সমস্ত কাজ শেষ। অথচ মন্দিরের চুড়ো ঠিক হচ্ছে না। শেষ পাথর বসান যাচ্ছে না কিছুতেই। এদিকে দিন এগিয়ে আসছে। রাজা নরসিংহদেবের কড়া হুকুম। নির্দিষ্ট দিনে মন্দির তৈরি শেষ করতেই হবে।

বিষণ্ণ বিষ্ণু মহারাণা ভেবে ভেবে কুল খুঁজে পাচ্ছেন না। মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই কেবল ঘুরপাক খাচ্ছে।

এমন সময় দেবদূতের মতো হাজির হল সেই কিশোর।

বিষ্ণু মহারাণার শিল্পীরা সব একই গাঁয়ের।

ধর্মপদ বড় হবার পর থেকেই তার বাবাকে খোঁজে। খালি মাকে জিজ্ঞেস করে, মা আমার বাবা কোথায়!

মা বলে, তোমার বাবা অনেক বড় কারিগর। রাজার মন্দির তৈরি হচ্ছে, সেখানে কাজ করছেন উনি। ধর্মপদ আব্দার করে মায়ের কাছে, বাবাকে দেখতে যাবার। তার এখন বছর বারো বয়েস। মা অনেক বোঝায়, কিন্তু ধর্মপদ নাছোড়বান্দা। সে যাবেই।

অনেক বুঝিয়েও যখন কিছু হল না, তখন চোখের জলে বুক ভাসিয়ে মা বিদায় দিল ধর্মপদকে। কাঁকই দিয়ে আঁচড়ে দিল বাবরি চুল। পরিয়ে দিল নতুন হলুদ ধুতি, সবুজ চাদর। চন্দনের ফোঁটা এঁকে দিল কপালে, চোখে টেনে দিল কাজল। তারপর গালে একটা চুমু দিয়ে বলল, সোনা আমার, শোনো! আমাদের গাঁয়ে এক বিশেষ ধরনের কুল হয়। পাতা সুদ্ধু সেই কুল গাছের ডাল নিয়ে যাও তুমি। যদি তোমার বাবা তোমায় না চিনতে পারেন, তবে তুমি এই ডাল দেখিও। এরকম কুল আর কোথাও হয় না।

ধর্মপদ বেরিয়ে পড়ল। ও যাচ্ছে দূরে, বহু দূরে। ঝাপসা হয়ে আসছে মায়ের দুচোখ।

হাঁটতে হাঁটতে কিশোর ধর্মপদ এসে পৌঁছল সেই মন্দির-চত্বরে। অনেক দিন কেটেছে পথে। পা টলছে, শরীর ভেঙে আসছে, তবু বাবার সঙ্গে দেখা করতেই হবে তাকে।

বাচ্চা ছেলের কথা কে আর শোনে। বিষ্ণু মহারাণার নাম জিজ্ঞেস করতেই সবাই তাকায় তার মুখের দিকে—অবজ্ঞার চাউনি।

অবশেষে দেখা মিলল বিষ্ণু মহারাণার। বিষণ্ণ মুখ। শরীর ভেঙে গেছে। গালে হাত দিয়ে কি জানি কেবলই কি ভেবে চলেছেন। সামনে এসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ধর্মপদ। চমকে উঠলেন বিষ্ণু মহারাণা।

কে বাছা তুমি! এখানে এরকম সময়ে এলে—তোমায় তো ঠিক···।

এক কৌতুকের হাসি কিশোরের মুখে। হাতের মুঠোয় রাখা শুকিয়ে আসা কুলের ডাল আস্তে আস্তে নাড়াল বিষ্ণু মহারাণার চোখের সামনে।

সাপের ছোবল খাওয়ার মতো চমকে উঠলেন বিষ্ণু মহারাণা। এ কুলডাল তুমি কোথায় পেলে? কে তুমি? কি নাম তোমার বাবার?

আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল ধর্মপদ। তার মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এলো—বাবা!

কি যেন কি ঘটে গেল। ধর্মপদকে বুকের ভেতর টেনে নিলেন বিষ্ণু মহারাণা। চার চোখের জলে দুজনেরই মাথা বুক ভিজে যেতে লাগল।

মা কেমন আছে তোর? গাঁয়ের আর সবাই···! এর মধ্যে দৌড়ে এসেছে অন্যান্য শিল্পীরা। তারা তো অবাক। ব্যাপার জেনে বুঝে একের পর এক প্রশ্নের ঢেউ। সবাই জানতে চায় গাঁয়ের খবর। বাড়ির খবর।

কেন এ সময়ে এলি তুই?

ধর্মপদ অবাক চোখে তাকায় বাবার মুখের দিকে। এরকম প্রশ্ন

সে আশা করে নি বাবার মুখে। কত দিন বাদে দেখা। চিন্তার রেশ কাটে বিষ্ণু মহারাণার কথায়। আর মাত্র কটা দিন তারপরই···।

কথা শেষ হয় না বিষ্ণু মহারাণার। ধর্মপদর বুকের তলায় বিপদের ঘণ্টা বাজে।

থামলেন কেন বলুন। দৃঢ়স্বরে বলে ধর্মপদ।

শুনে আর কি করবি! বারো শ শিল্পী নিয়ে আমিই হিমসিম খাচ্ছি। মান-সম্মান তো গেছেই, এবার প্রাণ না যায়!

ব্যাপারটা খুলে বলুন না আমায়।

সব শেষ হয়ে গেছে। এখন কেবল বাকি চুড়োর পাথর বসান। সেটাই আমরা কেউ পেরে উঠছি না।

আমি পারব। আমায় আদেশ করুন। আমার শরীরে যদি বিষ্ণু মহারাণার এক ফোঁটা রক্ত থাকে তাহলে···। ধর্মপদর গলায় মেঘের ডাক।

শিউরে ওঠেন বিষ্ণু মহারাণা। আশপাশের শিল্পীদের কণ্ঠস্বর ছাপিয়ে তার গলা উঁচুতে ওঠে, নাহ্, তোকে কিছুতেই আমি এভাবে মরণের মুখে ঠেলে দিতে পারি না। তাছাড়া মন্দিরের ব্যাপারে তুই জানিস কি?

জানি না জানি, আমি উঠবোই। আমি পারব। আপনি আমায় আশীর্বাদ করুন। যদি আমায় নেহাৎ আপনি আদেশ নাই করেন, তাহলে আমি অনশনে প্রাণ দেব।

পরদিন ভোরে প্রথম সূর্যের আলো ফোটার আগেই বিষ্ণু মহারাণাকে প্রণাম করে মন্দিরের একদম চুড়োয় আস্তে আস্তে উঠে গেল ধর্মপদ। ওপরে, আরও ওপরে। একদম মাথায়।

ধর্মপদ এখন একটা কালো ফুটকি।

এই অব্দি বলে বাবা একটু থামল। শীতের রাত্তির। রাত অনেক বেড়ে গেছে। চারপাশ নিঝুম! বাবা নতুন করে একটা

সিগারেট জ্বালালো। রসগোল্লা খাবার মতো হাঁ করে আছে পিপুল গল্পের শেষ শোনার জন্য।

গলা খাঁকরে বাবা আবার নতুন করে শুরু করল। এরপর ধর্মপদর ইতিহাস বড্ড রহস্যে ঘেরা, তবে ধর্মপদ আর ফিরে আসে নি। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো বাবার বুক ছাপিয়ে।

চুড়ো ঠিক মতো বসিয়েছিল ধর্মপদ। কেউ কেউ বলেন ওখান থেকেই চন্দ্রভাগায় ঝাঁপ দেয় ধর্মপদ। আবার কেউ কেউ বলেন, বিষ্ণু মহারাণার লোকজনরাই ধর্মপদকে ঠেলে চন্দ্রাভাগায় ফেলে দেয়। তাদের অপকীর্তি ঢাকার জন্যে।

যাই হোক ধর্মপদকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। পাথরে নাকি এখনও রক্তের দাগ দেখতে পাওয়া যায় খুঁজলে। এটা অবশ্য স্থানীয় লোকেদের বিশ্বাস।

ধর্মপদকে নিয়ে অনেক কবিতা-গাথা লেখা হয়েছে ওড়িয়া সাহিত্যে। আছে অনেক কাহিনী। জানি না, এর কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে! তবুও শুনতে ভালো লাগে। ভালো লাগে বলতে।

ধর্মপদর কথা শুনে পিপুলের চোখে জল জমেছিল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে জল মুছল। রাত অনেক হয়েছে, ঘুম আসছে না পিপুলের চোখে কিছুতেই। ঘুঙুর কোলের ভিতর ঘুমিয়ে কাদা। ওকে কোল থেকে নামিয়ে ওর বিছানায় শুইয়ে দিল। বাবা-মা চলে গেল নিজের ঘরে।

ঘরের দরজা বন্ধ করতে করতে পিপুল শুধু ভাবছিল ধর্মপদর কথাই।



জানলা দিয়ে ঘাড় হেলিয়ে অনেক চেষ্টা করেও বিবিদের আর দেখা গেল না। ঝড়ের মতো ট্রেন ছেড়ে গেল প্ল্যাটফরম। এতক্ষণ সামান্য অন্ধকার ছিল কামরার মধ্যে। ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে ছোটার সঙ্গে সঙ্গে কামরায় আলো বেশ জোরাল হয়ে উঠল। ট্রেনের ঝাঁকুনি আর শব্দ শুনতে শুনতে পিপুলের মনে হতে লাগল গাড়িটা যেন বলছে, পুরী যাব গজা খাব, পুরী যাব…… !

জানালার ধারে বসেছে পিপুল। শীত যাই যাই করেও যেতে চাইছে না। বাবার কড়া হুকুম, জানলার কাঁচ ফেলে রাখতে হবেই। একটা হাতের চেটো দিয়ে কামরার ভেতরে আলো আড়াল করে পিপুল বাইরেটা দেখার চেষ্টা করছিল। দৌড়ে যাওয়া বুনো ঝোপ, মাটির বাড়ি, তালগাছ, পুকুর তার ওপর ছড়ানো ছিটনো জ্যোৎস্না, বড্ড সুন্দর লাগছিল।

মাঝে দু একটা খাল-টাল পেরুবার সময় একটা অদ্ভুত শব্দ উঠছিল। হাওড়া জেলার ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে গাড়ি মেদিনীপুর

জেলায় গিয়ে পড়বে। পিপুলের গায়ে সেই হলুদ ঘোড়সওয়ার ছাপ গলা অব্দি হাইনেক পুরো হাতা সোয়েটার। আর জিনসের একটা ঢিলে-ঢালা প্যান্ট। পায়ে বাটার কালো বুট।

বাবাও প্যান্ট পরে নিয়েছে। সারা বছর ধুতি-সার্টে অফিস করলে কি হবে, বাইরে বেরুবার জন্য বাবার একসেট টেরিকটের জামা-প্যান্ট আছে। পায়ের ফোল্ডঅলা, কোমরের সামনে প্লেট দেয়া পুরনো ঢঙের টেরিকটের প্যান্ট। পায়ে কালো এ্যালবার্ট জুতো, গায়ে কোট। গলায় মাফলার। বাবার চোখে আজ সারারাত ঘুম নামবে না। পিপুল এটা ভালোমতনই জানে। বাড়ি থেকে বেরিয়ে অব্দি বাবা সাবাইকেই 'চোর' সন্দেহ করে। ধমকের ঠ্যালায় রিক্সাঅলা, কুলি, খাবারঅলা সক্কলে জুজু।

বাবা বাঙ্কের ওপর আধশোয়া হয়ে শুয়ে। মা পিপুলের পাশে আগাগোড়া চাদরে মুড়ি দেয়া। ঠাণ্ডা লাগলেই মায়ের দাঁতে ব্যথা হয়। মাড়ি ফোলে। দু-একটা সিনেমার কাগজ নিয়ে এসেছে মা ব্যাগে ভরে। পড়বার চেষ্টা করছে বোধহয়।

মালপত্তর বেশি নেয় নি বাবা। একটা হোল্ডঅল, একটা ব্যাগ, জলের পাত্র, টিফিন ক্যারিয়ার।

পিপুলের নিজস্ব একটা ব্যাগ আছে। তার ভেতর পিপুলের গোটা চারেক কলম, খাম, ডায়েরি, পেনসিল, আলগা কাগজ আর ফেলুদার এক সেট এ্যাডভেঞ্চারের বই। কয়েকটা ফাইভস্টারের প্যাকেটও রয়েছে। বিবি দিয়ে দিয়েছে। স্টেশনে এসেছিল বিবি। কাকু মিঠিমণিও, ওরা বেড়িয়ে ফিরেছে কদিন আগে।

পিপুলের হাতে হাতঘড়ি। বাবা ঘড়ি পরে আসে নি। একটাতেই কাজ চলবে বলে। পিপুলেরটা সোনালি ডায়ালের হেনরি স্যাণ্ডোজ। পৈতেতে পাওয়া, বড়মাসিমা দিয়েছিল।

ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার সঙ্গে একটা লাল রঙের খুদে এরোপ্লেন লাগিয়ে নিয়েছে পিপুল। কাঁটার সঙ্গে সঙ্গে প্লেনটাও চরকি পাক

দেয় ঘড়ির ভেতর। দরজা দিয়ে ঢুকেই গাড়িটার বাঁদিকে বসে আছে পিপুলরা। বাঙ্কের ওপর বাবা, নীচে পিপুল আর মা।

মার গলায় সুদ্ধু একটা চিলতে নকল সোনা, গিল্টির হার। হাতে শাঁখা আর স্রেফ একজোড়া পলা বাঁধানো। টাকাও রাখা আছে আলাদা আলাদা। ছোট্ট নতুন কাপড়ের গেঁজেতে মার কোমরে। বাবার কাছেও আছে কিছু। এমনকি পিপুলের কাছেও পঞ্চাশ টাকা। কড়কড়ে দশ টাকার নোট পাঁচখানা।

এছাড়া আছে পিপুলের নিজস্ব কুড়ি টাকা। হাতখরচা বাবদ বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে উঠবার আগে কাকিমা গুঁজে দিয়েছিল তার হাতে। পিপুলের ইচ্ছে এর থেকেই মিঠিমণি বিবি আর ওর ভাইয়ের জন্য নিয়ে যাবে কিছু কিনে।

এ-কথাটা মনে হতে আবার হাসি পেল পিপুলের। মনে পড়ে গেল মার কাছে শোনা 'কিছুমিছু'র গল্পের কথা।

সেই কোন্ এক নতুন জামাইকে তার মা বলেছিল, শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় 'কিছুমিছু' কিনে নিয়ে যাবি। সেই বোকা জামাই 'কিছুমিছু' খোঁজ করে করে শেষে এক বিশাল কচু ঘাড়ে করে হাজির হয়েছিল শ্বশুরবাড়ি। চালাক দোকানি ওর 'কিছুমিছু' চাওয়া দেখে ওকে এক মানকচুই গছিয়ে দিয়েছিল। সে ভারী মজার গপ্পো। ভাবলেই হাসি পায়।

ডানদিকের সিটে বসে আছে এক অবাঙালি পরিবার। অনেকগুলো কাচ্চাবাচ্চা। এক একটা খুদে রাক্কোস। স্টেশন থেকে খেতে শুরু করেছে। খালি ক্যাম্পোকোলা, চানাচুর, বাদাম, প্যাটিস পরপর খেয়ে যাচ্ছে, খাচ্ছেই।

ট্রেনে উঠলেই কেমন যেন খিদে পেয়ে যায়। পিপুলও মার কানের কাছে মুখ এনে ওর খিদের কথা জানাল। মা টিফিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা খুলে ক্যারিয়ারের বাটিতে পরোটা আলুভাজা সন্দেশ সাজিয়ে দিল। সেই রাক্কুসে বাচ্চারা জুল জুল করে তাকিয়ে ওর খাবারের দিকে।

লজ্জায় পিপুল কাকের মতো চোখ বুজে খাবার খেয়ে যেতে লাগল। বাবা বলতে গেলে কিছুই খেল না। বলল, রাত জাগতে হবে···।

খাওয়া শেষ হলে প্লাস্টিকের গেলাসে কম্বল মোড়া ওয়াটার বটল থেকে জল ঢেলে দিল মা। হাওড়া স্টেশনের জল। স্টেশনের জলে কেমন একটা ওষুধ ওষুধ গন্ধ থাকে। জল খেতে গিয়ে সেই গন্ধ এখন পেল পিপুল। গাড়ির নাড়াচাড়ায় সামান্য জল গেলাস থেকে গড়িয়ে পড়ল গায়ে।

জল খেয়ে আবার জানালার ধারে গ্যাঁট হয়ে বসা। হাতের চেটোয় জানালার কাঁচ আড়াল করে পিপুল বাইরে ছুটে যাওয়া পৃথিবী দেখতে লাগল।

ঘুঙুরকে টিকিট কেটে পারমিশন করিয়ে কামরার ভেতর আনিয়ে নিয়েছে বাবা। ঘুঙুর দিব্যি সিটের তলায় ঘুমুচ্ছিল। পিপুলের হাত চলকে বেশ খানিকটা জল গেলাস থেকে পড়ে গেছল নীচে। সেই গড়ানো জলেই বোধহয় ঘুঙুরের পেট ভিজে গেছে। কুঁই কুঁই করে একটা আলতো বিরক্তির শব্দ তুলে ঘুঙুর এসে হাজির সিটের সামনে। ট্রেনে উঠেই সবার আগে পিপুল ওর গলার চেন খুলে দিয়েছে।

ঘুঙুর সামনের ত্বপায়ে ভর দিয়ে সিটে উঠতে চাইল। মা ওদিকে কানের পাশে হাত দিয়ে সিটে মাথা ঠেকিয়ে ঢুলছে। ঘুঙুরকে পিপুল হাতের ভর দিয়ে ওপরে টেনে নিল। তারপর সিটে পাতা হুভাঁজ করা কম্বল-সতরঞ্জির তলায় ঘুঙুরকে দিল চালান করে। জানলার একদম পাশে পিপুল আর জানলার মধ্যিখানে যে কোণ, সেই কোণেই শুয়ে রইল ঘুঙুর ল্যাজমুখ এক করে। শোয়ার আগে কেবল পিপুল ওর ব্যাগ থেকে ঘুঙুরের উলের সোয়েটার বের করে পরিয়ে দিল। তার আগে সারা গা ভালো করে মুছিয়ে দিল ঘুঙুরের তোয়ালে দিয়ে।

ট্রেন খুব জোরে জোরে দৌড়ে চলেছে। সেই শব্দ উঠছে—পুরী যাব গজা খাব, পুরী যাব···। জ্যোৎস্নামাখা গাছপালা মনে হয় ছুটে

চলেছে গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে। সত্যি সত্যিই যে ওরা গাড়ির সঙ্গে ছুটছে না এটা পিপুল ভালো করেই জানে। এরকম কেন হয়, তা সে বিজ্ঞান বইতে আগেই পড়েছে।

মাঝে মাঝে এক-আধটা ফাঁকা প্ল্যাটফরম পেরিয়ে যায়। দু-একজন মুড়ি সুড়ি দেয়া মানুষ, সামান্য এক ঝলক আলো, একটা একলা লেভেল ক্রসিং। এই মেল ট্রেন কিন্তু সেই সব প্ল্যাটফরমে দাঁড়ায় না। সবুজ আলো দুলে দুলে ওঠে। গাড়ি দৌড়য়।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে বসে চিঠি লেখা যায় না। না হলে পিপুল একটা চিঠি লিখে ফেলত এক্ষুনি বুল্লিদাকে। ইস্, কতগুলো ক্রিকেট ম্যাচ যে ফসকে গেল। কত খেলা। রাণ। খালি মনে পড়ছে বুল্লিদার সেই কথা, সোবার্স, তোমাকে ভালো খেলতেই হবে। পিপুলের মনে হল কাল ভোর আর বিকেলে মৈনাক জয় বাবলা শাওন, ওরা প্র্যাকটিশে যাবে। ওদের পি. টি. করাবে বুল্লিদা। খেলাবে, ভুল হলে বকবে, ভালো হলে বুকে জড়িয়ে ধরবে আনন্দে। পিঠে চাপড় দেবে। কাল স্টেশনে নেমেই বুল্লিদাকে একটা চিঠি লিখতে হবে। আর চিঠি দিতে হবে কাকিমা, কাকু, মিঠিমণিকে। বিবিকেও চিঠি দিতে হবে। শাওন মৈনাক জয় বাবলাদেরও।

বিবিদের বাড়িতেও যাওয়া হবে না অনেকদিন টি. ভি দেখতে।

যাই হোক, যেখানে যাচ্ছে পিপুল সেখানেও অনেক মজা। আছে মায়ের সেই মেজদা—মেজোমামা। যে ইন্দ্রজিতের পার্ট করত পাড়ার যাত্রায়, শুঁয়োপোকা পুষত আর পালিয়ে গেছিল বাড়ি থেকে যুদ্ধে। সেই মজার মেজোমামার কথা ভাবতেই পিপুলের বুকের ভেতর অলৌকিক সুখের নীল পাখিটা ওড়াউড়ি করছিল।

সোয়েটারের নীলমাঠের ওপর দৌড়ে যাওয়া হলুদ ঘোড়সওয়ারের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে হাই উঠতে লাগল। ঘুম আসছে। বাবা বাঙ্কের ওপর চশমা পরে মন দিয়ে আজকের 'স্টেটসম্যান' পড়ে যাচ্ছে। এটা বাবার পুরনো অভ্যেস।

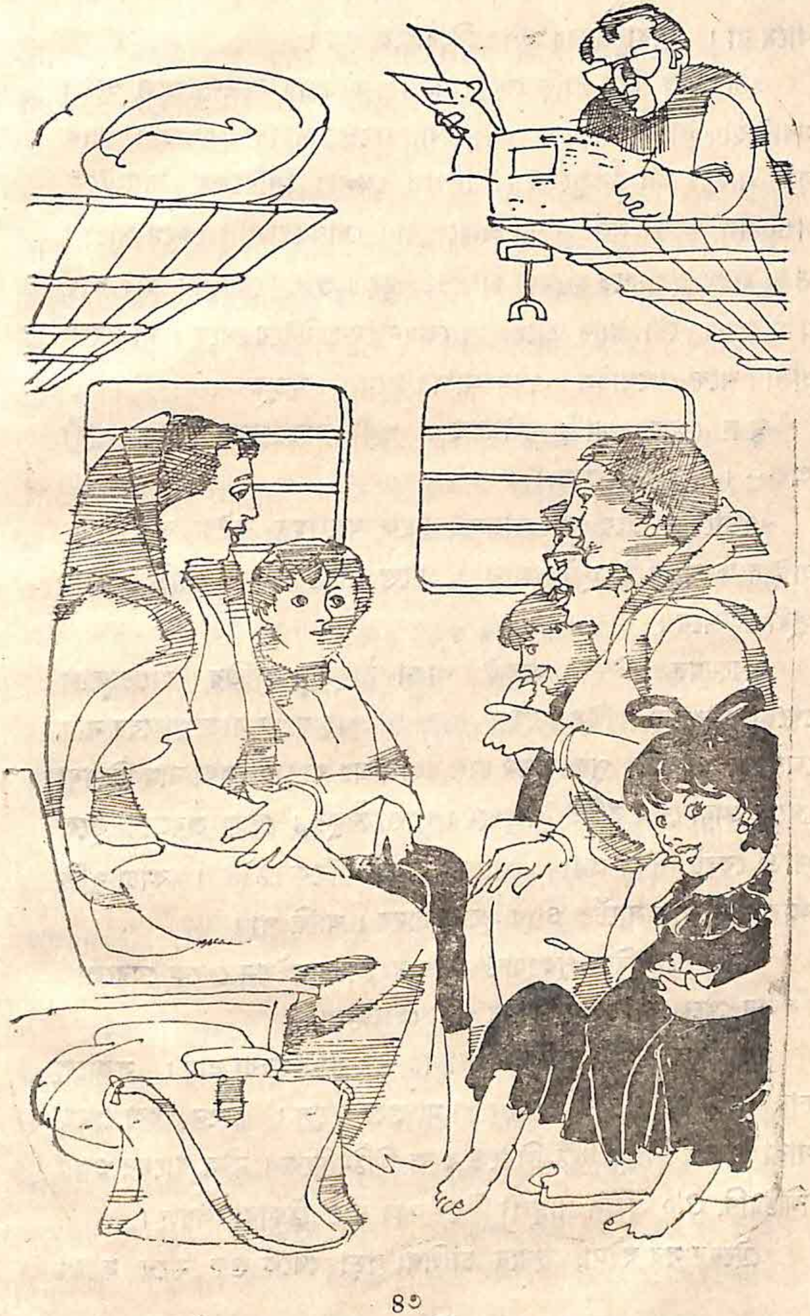


গাড়ির ছুলুনির সঙ্গে কখন যে ঘুম এসে গেছে, পিপুল টেরও পায়নি। নীচের সিটে বসে বাঙ্কের ওপর দেখা যায় বাবাকে। ঠিক মাথার ওপরে বাঙ্কে রয়েছেন এক গোবেচারা মুখের ভদ্রলোক। ডানদিকের বাঙ্কে একজন অবাঙালি মানুষ। ট্রেন ছাড়তেই সুর করে হনুমান চালিশা পড়তে শুরু করেছেন। মাথার মধ্যিখানে সিঁথি, কাঁচাপাকা চুল। কপালে হলুদ টিপ। সেই রাক্কোস ছেলেপিলে-গুলোর সঙ্গে চলেছেন বোঝা যায়।

হঠাৎ অন্ধকার। ঘুঙুর চেঁচিয়ে উঠল। এই আঁধারে ঘেউ ঘেউ কেমন যেন ভুতুড়ে। গাড়ি থেমে গেছে। বন্ধ দরজায় আওয়াজ হচ্ছে। ঠক ঠক। দুম দুম। প্রথমে আস্তে। তারপর জোরে। ডানদিকের বাঙ্ক থেকে পাঠ শোনা যাচ্ছে না। সিয়ারাম সিয়ারাম চিৎকার শোনা গেল। ওরই নীচে সিটের ওপর বসা মা আর দুই ছেলে একই সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, ক্যা হোইলন ? ক্যা হোইলন ?

দরজায় ধাক্কা বাড়ছে। জোরে। আরও জোরে।

পিপুল পেন্সিল টর্চ জ্বেলে ব্যাপার বোঝার চেষ্টা করে। চারপাশ



দেখে নেয়। ঘুঙুরকে চাপড় দেয় আলতো। তবু ওর ডাকাডাকি থামে না। বাবা বাঙ্কের ওপর সিধে হয়ে বসে।

হঠাৎ কুক দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দেয়। কামরার আলো জ্বলে ওঠে। সবাই হাঁফ ছাড়ে। কিন্তু দরজা ঠেলা রহস্যের সমাধান হয় না। আর ঘুম আসছে না কিছুতেই। পিপুল ফেলুদা সিরিজের 'গ্যাংটকে গণ্ডগোল' খুলে বসল। বাবা আধশোয়া। চোখ বোজা। জেগে আছে। ভক্ত মানুষ সুর করে হনুমান চালিশা পড়তে শুরু করেছেন। খাই খাই করা ছেলে দুটো আর তাদের মা কেমন যেন মিইয়ে গেছে। মা দরজা ধাক্কার শব্দে জেগেছিল। এখন আবার ঘুমে। ঘুঙুরও।

হু-হু কোরে গাড়ি দৌড়চ্ছে। পুরী যাব গজা খাব। পুরী যাব···। বলতে বলতে।

এভাবে পেরিয়ে গেল জাজপুর ভদ্রক বালেশ্বর কটক ভুবনেশ্বর। বাইরে তখন ফুটি ফুটি আলো। আস্তে আস্তে ভোর। গাড়ি পৌঁছল পুরী স্টেশনে।

ভুবনেশ্বর স্টেশন থেকেই পাণ্ডা ঠাকুররা হাজির। হাতে লাল খেরো বাঁধানো চাউস চাউস খাতা। তার মধ্যে সাত পুরুষের নাম লেখা। শেষমেশ পুরুষোত্তম দাস মহাপাত্রর খাতায় লেখা নাম ঠিকানা থেকে জানা গেল ইনিই পিপুলদের পাণ্ডা ঠাকুর। তেল জবজবে চুলে পাতা কেটে সিঁথি করা। পানের রসে টুকটুকে ঠোঁট। কাচা ধুতি আর শাদা হাফ সার্টের ওপর তুষের চাদর। খালি পা।

ওদের সঙ্গে নিয়ে পুরুষোত্তম দাস মহাপাত্র স্টেশন থেকে বেরলো। সেখান থেকে সাইকেল রিক্সায় পুরী হোটেল।

হোটেলের ঘরটা দারুণ। বিছানায় বসে সমুদ্র দেখা যায়। সকালে চানটান করে খাবার খেয়ে বাবা মা শুয়ে পড়ল। ট্রেনে ধকল গেছে সারা রাত। পিপুল চিঠি লিখতে বসল মিঠিমণিকে। নীল খামের ওপর মিঠিমণি, C/o প্রতুল গাঙ্গুলী লিখে তার নীচে ঠিকানা লিখল।

ট্রেনের সব ঘটনা, হনুমান চালিশা পড়া থেকে শুরু করে দরজা

ঠ্যালা—কিছুই বাদ গেল না। সব লিখে টিখে খাম বন্ধ করল। বিকেলে বেরোলে চিঠি ফেলে দেবে।

খাওয়ার পর গোটা দুপুর হাল্কা ঘুমের মধ্যে কেটেছে। বিকেলে বাবা মার সঙ্গে সমুদ্রের পাড়ে। স্টেশন থেকে আসার সময় রিক্সা থেকে সমুদ্র দেখেছে। কালো পিচ রাস্তার পরেই হলুদ বালি। তারপর সমুদ্র শুয়ে আছে। সব সময়ই ফুটছে। আকাশ আর সমুদ্রের নীল এক। ঢেউ আর ঢেউ।

এখন শীত। অনেকটা বালি পেরিয়ে সমুদ্রের কাছে যেতে হয়। পিপুলের এক দৌড়ে সমুদ্র ছোঁয়ার ইচ্ছে। বাবার বকার ভয়ে তা হল না। বালির ওপর পায়ের ছাপ। ঢেউ খাওয়ার জন্যে প্যাণ্ট গুটিয়ে বাবা জলের কাছে। সবুজ সবুজ জল। মাথায় শাদা ফেনা নিয়ে দুপায়ে ভেঙে পড়ছে। পা ধুইয়ে যাচ্ছে। ঘুঙুর জল দেখে সাত হাত দূরে।

মায়ের হাত ধরে পিপুল একটু দূরে। হঠাৎ বাবা পেছিয়ে এসে হাত ধরে হিড় হিড় করে টানল। পিপুলের সঙ্গে সঙ্গে মাও বাবার টানে পৌঁছল জলের কাছে।

দু-পাশে বাবা মা শক্ত হাতে পিপুলের হাত ধরেছে। মধ্যিখানে পিপুল। বেশ কিছুটা দূরে নীলচে সবুজ জল ফুলে উঠল। তারপর শাদা ফেনার মুকুট মাথায় নাচতে নাচতে হুড়দাড় করে দৌড়ে এলো।

পিপুল হাল্কা গলায় বলল, ওমা!

ওদের তিনজনকে জলে নামতে দেখে ঘুঙুর ঘেউ ঘেউ করে উঠে দূরে বালির ওপর বসে রইল। আর দু-তিনটে নেড়ি কুকুর, যারা সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ঠাট্টা করছিল, খেলতে খেলতে নেমে উঠে আসছিল ঢেউয়ের সঙ্গে, তারা একটু বিরক্ত ঘুঙুরকে দেখে। ভাবখানা এমন—কোথাকার ভিতুরে বাবা! পায়ের তলা দিয়ে সরসর করে বালি সরে যাচ্ছে। কুরকুর করছে পায়ের তলায়। সমস্ত গা শির শির। এত জল! শুধু নুন আর নুন। সমুদ্রের জল লাগলে পা হাত চিট

চিট করে। এভাবে ঢেউ খেতে পিপুলের বড্ড ভালো লাগছে। বিকেলে সমস্ত পাড় জুড়ে অসংখ্য মানুষ। রঙ আর রঙের মেলা।

সমুদ্রের ধার বলেই হয়ত ঠাণ্ডা এখানে বেশ কম। দূরে দূরে ও-টানো নুলিয়াদের নৌকো। ঢেউয়ের মাথায় ছোঁ মারা পাখিদের দেখতে দেখতে সমুদ্রের বুকের ওপর টুপ্পুস করে সূর্য ডুবে গেল। লাল লাল আভা ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত আকাশে। চারপাশে আবির খেলার রঙ। আস্তে আস্তে অন্ধকার এলো নেমে।

অন্ধকার ছেয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র থেকে একটু পিছিয়ে এলো ওরা। রুমাল পেতে বসে পড়ল। বাদামঅলা ঘুরে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। বাবা বাদাম কিনল। সঙ্গে চেয়ে নিল ঝালনুন।

সমুদ্রের শব্দে চাপা পড়ল বাদাম ভাঙার আওয়াজ। রাতের অন্ধকারে মনে হয় কালো ঢেউয়ের মাথায় হীরেমানিক রেখেছে কেউ। কিংবা দামী কোনো মুকুট। দূরের ঝাউবন থেকে হু-হু করে হাওয়া আসে। ঠাণ্ডা বাড়ছে। পেছন দিকে রাস্তার ওপর টিউব ল্যাম্প জ্বলে উঠল। রাস্তার ওপারের সব হোটেলে আলোর মালা।

বাদামঅলার সঙ্গে আসছে শাঁখ-ঝিনুকে তৈরি খেলনাঅলা। পাথরের মালা, বড় শাঁখও আছে। শাঁখ বাজাতে বাজাতে এইসব বিক্রি করছে।

চারপাশ দেখতে দেখতে সমুদ্রের ধমক শুনে শুনে রাত বাড়ে।

অন্ধকারে সারা শরীর মিশিয়ে দিয়ে ঘুঙুর বসে। পিপুলরা উঠে পড়া মাত্র গা ঝেড়ে উঠে পড়ল ঘুঙুর। হোটেলে ঢুকবার আগে মিঠিমণির চিঠি লাল ডাক বাক্সে ছেড়ে দিল পিপুল।

হোটেল-ঘরে রাতের খাওয়া শেষ করে পিপুল আবার ফেলুদার সঙ্গে গ্যাংটক রওনা হলো। গণ্ডগোল বেশ জমেছে। পড়তে পড়তে হাই। দুচোখে ঘুমের ঢুল ঢুলনি। তারপর ঘুম।

সাত সকালে ঘুম ভেঙেছে পিপুলের। বাইরে, আকাশে তখনও কালির পোঁচ। ঠাণ্ডা হাওয়া। জামাটামা পরে তিনজন বাইরে এলো।

আশ্চর্য সুন্দর পৃথিবী। একটা ছুটো মানুষ। আবছা আবছা রাস্তা। নুলিয়ারা তখন নৌকো ভাসাচ্ছে। মাছ ধরতে যাবে দূরে। মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে। হাঁটু জল থেকে দৌড়তে দৌড়তে বেশি জলে ঠেলে দিচ্ছে নৌকো।

হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের পাড়ে। ওদের সঙ্গে ঘুঙুর। এখানেই আলাপ শিবদার সঙ্গে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় কালো পাথরে তৈরি মূর্তি। ছোট্ট এক টুকরো কাপড় লেংটি করে পরা। সারা গায়ে আর কিছু নেই। মাথায় নারকেল পাতায় বোনা শাদা রঙের তিনকোণা টুপি। তার ওপর কালো রঙে নম্বর লেখা। শিবদা প্রায় ওদের সঙ্গেই এসেছে সমুদ্রে। ও পুরী হোটেলের নুলিয়া। হোটেলের মানুষজনকে চান করায়।

দুপুরে শিবদা খুব যত্ন করে চান করাল ওদের। ঢেউয়ের পরে ঢেউ আর ঢেউ। ঢেউ ভাঙার আগে দুকানে আঙুল দিয়ে চোখ মুখ বুজে মাথা নীচু কর। মাথা টপকে বয়ে যাবে। মাথা মুখ উঁচু থাকলেই বিপদ। আছড়ে ফেলে দেবে পাড়ের ওপর। নাক মুখ ছেঁচে যা-তা হবে।

অনেকক্ষণ চান করিয়েছে শিবদা ওদের তিনজনকে। পিপুলকে টায়ারে ভাসিয়ে ঢেউয়ের মাথায় দোল খাওয়াল অনেকক্ষণ। চারপাশে চানের হুড়োহুড়ি। ভিজে গায়ে ছবি তোলার হিড়িক। কেউ কেউ জলের ভেতর দাঁড়িয়েও ছবি নিচ্ছে। ট্রেনে সিয়ারাম সিয়ারাম বলা সেই অবাঙালি ভদ্রলোক আর পেটুক ছেলেপুলেদের সঙ্গে দেখা। ওদের মুখ সমানে নড়ছে। নুলিয়াদের ছেলেরা ঘুরছে চারপাশে।

শিবদার এত কায়দাতেও পিপুলের কানে নাকে মুখের ভেতর বালি, মাথার চুলে, সর্ট প্যান্টের খাঁজে বালির চিকিমিকি।

চানের এই মহোৎসব দেখে ঘুঙুর কিছুটা ঘেউ ঘেউ করে ক্লান্ত। শিবদাকে একটু তাড়া করার তালে ছিল। পিপুলের ধমক খেয়ে চুপ।

সমুদ্র সেরে হোটেলে ফিরে আবার চান। শাওয়ার খুলে সারা গায়ে সাবান। মাথায় শ্যাম্পু। তবুও নুন আর গা চিট চিট যেন ছাড়ে না।

কি খিদে আর ঘুম রে বাবা। কলকাতায় যদি এমনটি হতো। ফেলুদাকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তেই পিপুলের দুচোখে ঘুমের কাজল। মায়ের তখন নাক ডাকছে।

বিকেল হওয়ার আগেই আবার সমুদ্রের কাছাকাছি। সমুদ্রের পাড়ে তখন রঙ আর রূপের মেলা।

ওল্টানো নৌকার ওপর, জলের মধ্যে, ঝাউবনে নানান কায়দার ছবি তুলেছে বাবা, সঙ্গে শিবদা ঘুঙুর। বাবা দেখিয়ে দেওয়ার পর দুটো ছবি তুলেছে পিপুলও, যার মধ্যে বাবা আছে ঘুঙুরকে কোলে নিয়ে। বেলা পড়ে আসতেই অনেকে নেমে পড়েছে রবারের টিউব নিয়ে জলের মধ্যে। সে এক মজার কাণ্ড।

সেদিন রাতে হোটেলে এসে হাজির হয়েছে পাণ্ডাঠাকুর—পুরুষোত্তম দাস মহাপাত্র। কাল সকালে মন্দিরে নিয়ে যাবার কথা বলতে। কথা-টথা পাকা করে চলে গেছেন পাণ্ডাজী। ঘুঙুরকে নিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ডায়েরি লিখছে পিপুল। আজও সমস্ত ডায়েরিতে কেবল সমুদ্রেরই কথা। বিকেলে হোটেলে ফেরার আগে মিষ্টির দোকানে ছানার 'পোড়া পিঠে' খাওয়ার কথা ডায়েরিতে লিখতে ভুলল না।

পরদিন ভোরে হোটেলের শাওয়ারে নেয়েধুয়ে তৈরি হয়ে নিল ওরা। ঘুঙুরকে তো আর মন্দিরে নিয়ে যাওয়া যাবে না, তাই ওর পিঠে হাত-টাত বুলিয়ে, ওকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘরের ভেতরই চেন দিয়ে বেঁধে রাখা হল। প্রথমটায় অল্প আপত্তি তুললেও পিপুলের সব কথা শুনেই যেন ঘুঙুর গলায় চেন বাঁধার ব্যাপারটা মেনে নিল। এর মধ্যে পুরুষোত্তমদা এসে হাজির।

দুটো রিক্সা ডেকে এনে একটায় বসল পিপুল আর পুরুষোত্তমদা। অন্যটায় বাবা-মা। সামনের রিক্সায় পুরুষোত্তমদা-পিপুল, পেছনে বাবা-মা। ঘুঙুরকে না নিয়ে আসতে পারার জন্য পিপুলের মনটা যেন

কেমন কেমন করছিল। সময়টা শীতকাল হলেও চান করতে গিয়ে পিপুলের বেশি শীত লাগেনি। আজও ঢিলে জিনস-এর প্যান্ট আর নীল মাঠের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়া হলুদ ঘোড়সওয়ার আঁকা সোয়েটার পরেছে। পায়ে অবিশ্যি হান্টিং বুট নেই, একেবারেই খালি পা—মন্দিরে ঢোকার জন্যে।

রিক্সা চলেছে সাঁই সাঁই করে। রিক্সাঅলা প্রায় হ্যাণ্ডেলের ওপর উঠে চালাচ্ছে। আশ্চর্য ঘন্টি বাজছে—টুং টাং। কাঁসার ওল্টানো বাটির মতো ঘণ্টার গা। তার গায়ে লোহার সরু লাঠি বাজছে। কানের পাশ দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে হাওয়া। এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে পিপুলের চুল। কাঁচা-মিঠে রোদ্দুর এখন চারপাশে। পুরুষোত্তমদার গা থেকে কি রকম একটা চন্দন চন্দন গন্ধ আসছে।

জগন্নাথ-মন্দিরে পৌঁছে পুজোর টাকা জমা দিল বাবা। পুজোর প্রসাদ—খাজা-গজা—দন্ত-ভাঙা খয়েরচুর তালপাতার টুকরিতে পরে পাওয়া যাবে শুনল। আটকে বাঁধার কি একটা ব্যাপার ছিল। বাবা তার ধারকাছ দিয়েও গেল না।

মন্দিরে ঢুকবার মুখে সিংদরজার কাছে কোণারক থেকে আনা অরুণস্তম্ভ দেখল ওরা। পুরুষোত্তমদা বলল, মন্দিরের ভেতর জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার বেদী যত উঁচু, ঠিক ততটাই উঁচু অরুণস্তম্ভ। আর দেখল শাদা চুনকাম করা অদ্ভুত ধরনের নাক খাড়া, মোটা কালো গোঁফওয়ালা সিংহ। যার সঙ্গে চিড়িয়াখানার বা কালিপটকার প্যাকেটে দেখা সিংহের ছবির অনেকটাই মিল নেই। মন্দির চত্বরের মধ্যে জগন্নাথের পালকি, ভুশুণ্ডির কাক, জেলবন্দী একাদশী, বিমলাদেবী এ সব দেখল পিপুলরা।

বড্ড পয়সা চায় সকলে। খালি বলে, গড় কর, পয়সা দিও। মাথা কর। মাথা কর।

জগন্নাথের মন্দিরের ভেতর নামতে নামতে পুরুষোত্তমদা বলছিল—উচ্চ-অ। নিচ-অ।

চারপাশে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার মতো। ঘিয়ের প্রদীপ তুলে ধরে পুরুষোত্তমদা। মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতর ইলেকট্রিক লাইট আসে নি। এ বেদী নাকি নারায়ণ শিলা দিয়ে তৈরি, তার ওপরই দারুব্রহ্ম—জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি বসানো। শুধু তাই নয়, স্বয়ং বিশ্বকর্মা নাকি এ ত্রিমূর্তি তৈরি করেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ের আগে মন্দিরের দরজা খোলার জন্যই নাকি ত্রিমূর্তির হাত-পা তৈরি হয় নি। তাই বোধহয় ঠুঁটো জগন্নাথ কথাটা চালু আছে।

অন্য কথাও আছে একটা। বৌদ্ধদের বুদ্ধ ধর্ম আর সংঘ এই তিন মিলেই নাকি এই ত্রিমূর্তি! যাক গে যাক, যা খুশি হোক গিয়ে। এ-সব নিয়ে মাথা ঘামাতে পিপুলের ভালো লাগে না। আর বিশ্বকর্মাকে দিয়ে মন্দির বা দেবমূর্তি তৈরি করার গল্প ভারতের প্রায় সব তীর্থেই গিয়ে পিপুল শুনেছে।

ত্রিমূর্তি প্রদক্ষিণ করেছে পিপুলরা। এটা করলে নাকি অক্ষয় পুণ্য হয়! কাঁপা কাঁপা ঘিয়ের প্রদীপ তুলে দেখিয়েছে পুরুষোত্তমদা। ডানদিকে জগন্নাথ মাঝে সুভদ্রা তারপর বলরাম। সেখানেও এক গল্প। সমুদ্র নাকি বিয়ে করতে চেয়েছিল সুভদ্রাকে। আর সেই ভয়েই সুভদ্রা এসে লুকিয়েছে দুই দাদার মাঝে। জগন্নাথের কপালের হীরে ঝিকিয়ে ওঠে কাঁপা পিদিমের আলোয়। সুভদ্রা-বলরামের কপালে পান্না-চুনী ঝলমল করে। এই জগন্নাথের হীরের পেছনেও এক দারুণ গা-ছমছমে গল্প আছে।

গল্পটা এ-রকম।

সমুদ্রে ভেসে যাওয়া এক সওদাগর সাপের মাথার মণি তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। পেছনে সাপ, মণির আশায়। জাহাজ ধরে ফেলে প্রায় নাগরাজ। শেষ অব্দি সওদাগর জগন্নাথের কাছে মানত করল—বাঁচলে এ মণি তোমার হবে প্রভু! তখন জগন্নাথ নাকি স্বয়ং বিরাট কাঁকড়ার বেশে এসে গলা কেটে নেয় সাপের।

তারপর? তারপর আর কি? আমার গল্প ফুরলো। নটে গাছটি

মুড়োলো। প্রাণে বেঁচে সওদাগর সে মণি লাগিয়ে দিল জগন্নাথের মাথায়।

গল্প যেমনই হোক, তা শুনতে বেশ ভালোই লাগে। তাই এ-গল্পও পিপুলের খারাপ লাগল না।

ঘুরে ঘুরে জগন্নাথের 'রান্নাবাড়ি' দেখল ওরা। সে এক যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার যাকে বলে। কাঠের আগুনে একটার ওপর একটা হাঁড়ি বসিয়ে অদ্ভুত কায়দায় রান্না। মশলা জল কাঁচা তরকারি চাল ডাল একই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে। নাড়াচাড়া খোলাখুলির বালাই নেই। যেন কোন প্রাচীন প্রেসার কুকার।

পুরুষোত্তমদা বলল, ১,৫০০ ব্রাহ্মণ কাজ করে এই রান্নাবাড়িতে। ৬০ মণ চাল রান্না হয় রোজ। ৫৬ রকম তরকারি ডাল শুক্তো হয় রান্না।

লক্ষ্য করে দেখল পিপুল এখানে যারা কাজ করছে, তাদের বেশির ভাগ লোকেরই পা ফোলা, গোদ।

পুরুষোত্তমদাকে জিজ্ঞেস করতে বলেছে, মহাপ্রসাদ মাড়ানোর জন্যে এ-অবস্থা। পিপুল বুঝল আসলে কিউলেক্স মশার কামড়েই এদের এই গোদ—ফাইলেরিয়ার কারণ। তবে মুখে কিছু বলল না। গরীব মানুষ, মশারি কিনবে কোত্থেকে ?

'আনন্দবাজারে' এসে অবাক হয়ে গেল পিপুল। রান্না করা মহাপ্রসাদ বিক্রি হয় এখানে। একটু লম্বাটে মাটির হাঁড়িতে ভাত-ডাল তরকারি সব কিছু পাওয়া যাচ্ছে। ইচ্ছে হলে চেখে ছাখ, তারপর কিনে ফেল। বাসি প্রসাদও পাওয়া যায়! এঁটো কাঁটার কোন বালাই-ই নেই।

ভাঙা হাঁড়ির কানা বা খুরি দিয়ে একটু ডাল-তরকারি তুলে চেখে দেখছে অনেকেই। ঠিক হয়েছে কিনা। আর প্রসাদের ওপর ভিন ভিন করছে মাছি আর মাছি।

জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা দর্শন করে বাইরে বেরিয়ে জগন্নাথের সমাধিক্ষেত্র দেখল পিপুলরা। নবকলেবরের পর নাকি এখানে পুরনো

দারুব্রহ্মকে দেয়া হয় পুঁতে। শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চিহ্নিত কাঠে হয় নতুন মূর্তি। অনেক হনুমান এখানে।

পুরুষোত্তমদা বলছিল রথের সময় খুব ভীড় হয় এখানে। মাসির বাড়ি তিনটে আলাদা রথে চেপে যান জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা। সাতদিন বাদে উল্টোরথে আবার ফিরে আসেন মন্দিরে। আর ভীড় হয় স্নানযাত্রার সময়।

মন্দির দেখে বাড়ি ফিরতে বেশ বেলা হয়েছে। আসবার আগে মা কাঁসা-পেতলের দোকান থেকে জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রা বাটি কিনেছে। আর কিনেছে 'পুরীর স্মৃতি' লেখা কাঁসার ডিশ।

হোটেলে ফিরে ঘুঙুরকে আদর করেছে পিপুল। তারপর খেয়েদেয়ে ঘুঙুরকে বেঁধে রেখে আবার দুটো রিক্সা নিয়ে বেরিয়েছে আশেপাশের অন্যান্য দেখার জিনিস আর মন্দির দেখতে।

লক্ষ্মীজলার কাছে এসে পিপুল পুরুষোত্তমদার থেকে জানতে পারল এখানকার ধান থেকেই ভোগ হয় জগন্নাথের। আর আছে লক্ষ্মীজলার মাছ।

মাসিরবাড়ি আঠারো নালা ভাস্বর-ভাদুর-বহুকুয়া সিদ্ধবকুল সোনার গৌরাঙ্গ গম্ভীরা দেখে ফিরতে ফিরতে রাত ঘন হয়েছে।

ন্যাকড়ার কোল-বালিশের মতো একদম পুঁচকে খোলের ভেতর শুকনো ভাতপ্রসাদ, নারকেল পাতার টুকরিতে খাজা গজা ঝালনাড়ু দন্তভাঙা খয়েরচুর দিয়ে গেল পুরুষোত্তমদা।

জগন্নাথের মন্দিরের কাছেও ওরা গেছিল কেনাকাটা করতে। মোষের শিং-এর একটা বড় চিংড়ি মাছ, মাছ মুখে জোড়া বক, নরম পাথরে (কুচিলার) তৈরি কোণারকের সূর্যমন্দিরের চাকা, মৃদঙ্গবাদিকা, এ-সব কিনল পিপুল। সঙ্গে ঝিনুকের খরগোস, পাখি, ধূপদানী। মিঠিমণির জন্যে শঙ্খের মালা কিনল মা। গোবরের বাঘ, হাতী, জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রাও কিনল ওরা।



সেদিন রাতে সমুদ্রের পাড়ে বসে সমুদ্রের গান শুনতে শুনতে পিপুলের মন কেমন কেমন করছিল। কাল ভোরেই ওরা চলে যাবে কোণারক। ঘুঙুর মাথা উঁচু করে মাঝে মাঝে হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছিল।

বিকেলে নুলিয়া-শিবদার সঙ্গে মুচিপাড়ায় গেছিল পিপুল। এখানে মুচিপাড়ার নাম মোচি শাহি, মন্দিরের কাছেই। জগন্নাথ মন্দিরের কাছ থেকে ফিরে, আবার আসতে হল ওখানেই। ছোট ছোট ঘরের ভেতরে কেমন যেন একটা চামসানি গন্ধ। হরিণ সম্বর গোসাপ ছোট বাঘ বনবেরাল শাদা আর বুনো খরগোস—সবেরই চামড়া বিক্রি হচ্ছিল। ছিল অনেক রামছাগলের চামড়াও।

শিবদা ওর ভাষায় দরাদরি বকাবকি করে বেল্টের জন্য একটা গোসাপের চামড়া আর জুতোর জন্যে একটা হরিণের চামড়া কিনে দিল। নরম চামড়ার গায়ে কালচে গুলির দাগ দেখে মনটা যেন কেমন কেমন করছিল পিপুলের।

সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ বসে ছিল ওরা। ফাইভ স্টার চকোলেট খেতে খেতে পিপুল ভাবছিল পুরুষোত্তমদা, শিবদার কথা। এ ক'দিনে ও কতই না ভালোবেসে ফেলেছে শিবদা, পুরুষোত্তমদা আর সমুদ্রকে। রাত নটা বাজতেই ওরা ফিরে এসেছে হোটেলে।

পরদিন কাকভোরে মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙল পিপুলের। বাথরুম টাথরুম করে নিয়ে ফটাফট জামা প্যান্ট পরে তৈরি হয়ে নিল। স্যুটকেস গোছান ছিল আগের রাতেই। হোল্ডঅল বেঁধে নিল বাবা। নারকেল পাতার তৈরি একটা খালি টুকরির ভেতর পিপুল ওর হাতে কুড়নো ঝিনুক-শাঁখ সমস্ত তুলে নিল। আর কিছু সমুদ্রের সোনালি বালি। মিনিট দশেকের মধ্যে সব গোছগাছ করে তৈরি হয়ে গেল ওরা। ঘুঙুরকেও ওর সোয়েটার পরিয়ে দিল পিপুল।

সব মোটমাট এক হোটেল বয়ের মাথায় চাপিয়ে বাস-স্ট্যাণ্ডে

এসে হাজির ওরা। টিকিট আগের দিনই কাটা ছিল। নীল-শাদায় ভারি সুন্দর লাক্সারি বাসটা দাঁড়িয়ে সমুদ্র থেকে কিছু দূরে বাঁধানো চওড়া রাস্তার ওপর।

ঠিক সাড়ে ছটায় বাস ছাড়বে।

পিপুল কায়দা করে উঠেই বাসে একটা জানালার ধারের সিট দখল করে নিল। ওর পরনে তখন ঢিলে জিনসের প্যান্ট, গোড়ালি ছাড়ানো হান্টিং বুট, হাইনেক সোয়েটার, মাথায় গরম টুপি। শিবদা পুরুষোত্তমদা কালই বাধার থেকে বাসের সময় জেনে গেছিল। ওরা দুজন এসে হাজির বাস-স্ট্যাণ্ডে। অনেক বলে-কয়ে ঘুঙুরের জন্যেও যাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে বাসে। ঘুঙুরও পিপুলের কোলে চড়ে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল। সামনের দুটো পা দিয়ে জানলা আঁকড়ে আছে। মাথাটা একটুখানি বাইরে।

শিবদা-পুরুষোত্তমদা, সমুদ্র, আদিগন্ত আকাশ, হলুদ বালির পাড়, দেখতে দেখতে পিপুলের চোখে কুয়াশা। আবার কবে আসা হবে, আদৌ আর আসতে পারবে কিনা, এ-সবই, সাত কাহন ভাবছিল। ইচ্ছে হচ্ছিল এক ছুটে ছুঁয়ে আসে সমুদ্রের জল আর বালি। কিন্তু সময় বড় কম। পিপুলের হাতের সোনালি হেনরি স্যাণ্ডোজে দুটো কাঁটা একসঙ্গে ছটার ঘরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাস হর্ন দিল।

বাস নড়ে উঠছে। চলতে শুরু করল।

বাবা-মা জোড়হাত করে বার বার নমস্কার করল জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা আর সমুদ্রকে। শিবদা-পুরুষোত্তমদার ঝাপসা মুখ, সমুদ্র, বালির পাড় সব আস্তে আস্তে গেল মিলিয়ে।

বাস চলেছে পিপলির পথে, বাসের গাইড বলল। তার হাতে মাইক্রোফোন।

নারকেল গাছ আর নারকেল গাছ। এসব দেখতে দেখতে

পিপুল ফাইভ স্টারে কামড় বসাল। বাড়ির লাল নীল মাছেরা মিঠিমণি আর বিবি কেমন আছে কে জানে?

বেশ কিছুক্ষণ বাস চলার পর পিপুলরা পৌঁছে গেল পিপলিতে। পিপলি উড়িষ্যার বহু পুরনো জায়গা। এখানে কাপড় কেটে বসিয়ে ভারি সুন্দর সুন্দর চাঁদোয়া আরও কি কি সব তৈরি হয়। আর হয় বড় বড় কাপড়ের ছাতা এ্যাপ্লিকের ব্যাগ।

পিপলিতে মিনিট সাতেক কাটাবার পর আবার বাস চলতে শুরু করল। গাইডের কথা এলো কানে—পিপলির পর সাক্ষীগোপাল।

ভারি সুন্দর গল্প আছে এই সাক্ষীগোপালের। ভক্তের ডাকে বৃন্দাবন থেকে আসছেন গোপাল সাক্ষী দিতে। তবে শর্ত একটাই কোন কারণে ভক্ত পেছনে তাকালেই গোপাল থেমে যাবেন।

ভক্ত চলেছেন সামনে। পেছনে গোপালের রুনু রুনু রুনু ঝুন নূপুরের শব্দ। বালির ওপর দিয়ে চলতে চলতে গোপালের নূপুরে গেল বালি ঢুকে। শব্দ আর হয় না। বেচারি ভক্ত পেছু ফিরে তাকাতেই গোপালও দাঁড়িয়ে গেলেন বালির ওপর। সেখানেই তৈরি হল মন্দির। গল্প বোধহয় গল্পই। সব তীর্থেই ছড়িয়ে আছে এরকম অজস্র কাহিনী।

সাক্ষীগোপালে নারকেল গাছ প্রচুর। বড় বড় ডাবও এখানে খুব সস্তা আর জল বড় মিষ্টি। একটা একটা গোটা ডাব খেল ওরা তিনজনে। পুজো দিল মা মন্দিরে। মন্দিরে ঢুকবার মুখেই শোনা যায়—'রাধে গোবিন্দ। রাধে গোবিন্দ।' ঘুঙুরকে নিয়ে বাসের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল পিপুল। বাবা-মাকে মন্দির ঘুরিয়ে এনে ওকে নিয়ে গেছিল। ঘুঙুর তখন মায়ের কাছে।

সাক্ষীগোপাল থেকে কোণারক। বেশ অনেকখানি টানা রাস্তা।

প্রায় বেলা দশটা নাগাদ ওরা এসে পৌঁছুলো কোণারক।

মূল মন্দিরের সামনে রথের ভাঙা ঘোড়ার ওপর হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মেজোমামা। চোখে বাইনোকুলার লাগানো।

মা কোণারকে এসেই খুঁজছিল মেজোমামাকে। চারপাশে চনমনে চোখ। টাক মাথা, মুখে ফরাসি কায়দার দাড়ি গোঁফ, চোখে চাঁদির চশমা। সেই অদ্ভুত কায়দায় মাঝে মাঝে নাক মুখ কুঁচকে চশমা ঠেলা আর ডান নাকের পাশে সেই আদি অকৃত্রিম আঁচিল দেখে মেজো-মামাকে চিনতে মার এবার আর কোনো অসুবিধে হল না।

প্রায় ছুটে গিয়ে নমস্কার করল মা ওই পাথুরে ঘোড়ায় ঠেস দেওয়া মানুষকে। মামা দু হাত দিয়ে তুলে ধরল মাকে। তারপর জড়িয়ে ধরল। —বিন্দি, তুই কতদিন পরে! মায়ের দুচোখে জল। মেজোমামারও।

দুজন বড়কে কাঁদতে দেখে পিপুলও যে কি করবে বুঝতে পারছিল না।

মেজদা, কতদিন বাদে দেখা! মায়ের গলায় কান্নামেশানো খুশি। বেচারি ঘুণ্ডুর কিছুই বুঝতে পারছিল না। কেবল এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিল।

পিপুল শুধু ভাবছিল সেই মেজোমামার কথা যে, ইন্দ্রজিতের পার্ট করত গাঁয়ের যাত্রায়, শুঁয়োপোকা পুষত কাঁচের বোয়ামে আর পালিয়ে গেছিল যুদ্ধে। পিপুল বার বার মেজোমামার মুখের দিকে তাকিয়ে সেই দামাল মানুষকে খুঁজছিল।

ভাইবোন—মা-মেজোমামা পর্ব শেষ হবার পর মেজোমামা এবার তাকাল ওদের দিকে। বাবা এগিয়ে এসে প্রণাম করল। আর পিপুল প্রণাম করতে যেতেই মেজোমামা লাফিয়ে প্রায় হাত দুয়েক দূরে সরে গিয়ে দরাজ গলায় বলে উঠল, প্রণাম ফ্রণাম নয়, হ্যাণ্ডশেক। হ্যাণ্ডশেক কর মাই বয়। তারপর বিশাল ডানহাতের পাঞ্জা এগিয়ে দিল পিপুলের সামনে। ওই বড় পাঞ্জার ভেতর পিপুলের ডান হাত গেল ডুবে। মেজোমামা হাতে একটা আলগা চাপ দিয়ে আলতো

ঝাঁকানি দিয়ে বলল, বিন্দি, তোর ছেলের হাত একেবারে মেয়েদের মতো। খেলাধুলো করে না নাকি? লজ্জায় পিপুলের কানমুখ লাল হয়ে যাচ্ছিল। ওর মাথা নীচু।

মা বলল, ক্রিকেট খেলে।

ধ্যুস, ক্রিকেট আবার একটা খেলা নাকি! খালি পাঁচ দিন ধরে খুট্টুস, খুট্টুস—খুট্। খেলার থেকে খাওয়ার যোগাড় বেশি। ছেলেটাকে রেখে যা আমার কাছে। গড়েপিটে লোহা করে দেব ক'দিনে। খালি যোগব্যায়াম, আসন, দৌড় আর ফ্রিহ্যাণ্ড একসারসাইজ। তারপর ঘুঙুরকে দেখিয়ে বলল, এটা আবার কি? কুকুর না খরগোস?

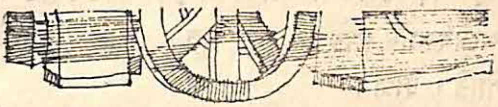
ওকে যাই বলা হোক না কেন, ঘুঙুরকে কেউ কিছু বললে পিপুলের মনে খুব লাগে, রাগ হয়ে যায়। নেহাত নতুন আলাপ একেবারে তাই। নাহলে পাঁচকথা শোনাতে ছাড়ত না পিপুল।

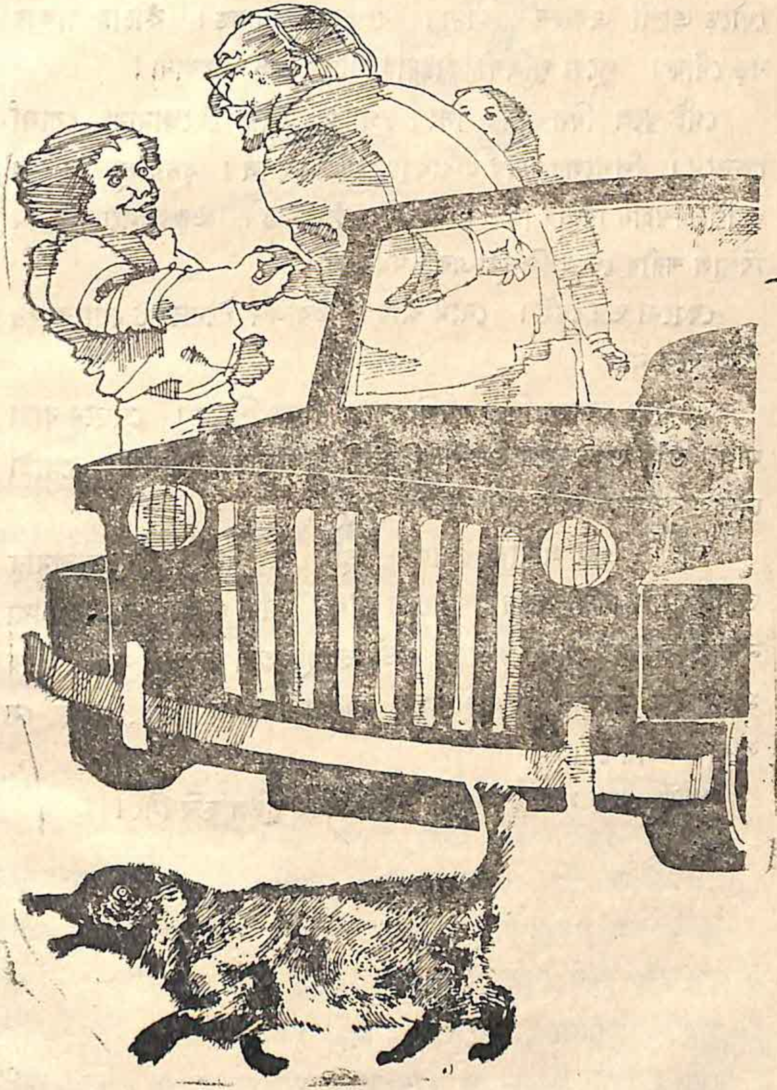
বাবার দিকে তাকিয়ে এবার বলল মেজোমামা, চেহারাটা কি করেছ প্রতুল! তোমাকেও ভাবছি সকালে দৌড়ুতে বলব, যা একখানা নেয়াপাতি ভুঁড়ি বানিয়েছ, তাতে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে, আর হার্টেও এফেক্ট করবে।

মেজোমামার গাঢ় সবুজ রঙের জিপ দাঁড়ান। মেজোমামাই ড্রাইভার।

একটু হেঁটে ওরা মালপত্র সমেত উঠে পড়ল গাড়িতে। সামনের সিটে মেজোমামার পাশে পিপুল। কোলের ওপর ঘুঙুর। খুব আস্তে গাড়ি চলছে। কোণারকের সেই বিশাল মন্দির ছেড়ে চলে যাচ্ছে ওরা আস্তে আস্তে। দুপাশে উড়িষ্যার পাথুরে জমি। বেলা বাড়লেও রোদ বড় মায়াবী। গায়ে লাগলে আরাম হয়। আকাশে উড়ে বেড়ানো পাখি। গাড়ির সামনের কাঁচে তার ছায়া। গাছের পাতায় চিকন রোদ্দুর। সবটাই কেমন স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হয় পিপুলের।

বড় রাস্তা থেকে ডান দিকে বাঁক নিল মেজোমামার জিপ। বেশ





বড় সড় দোতলা পাকা বাড়ি। শক্তপোক্ত। ঢোকার মুখে সামনে অনেকখানি জমি। ফুল গাছ। বড় সড় ঝাউ। নারকেল সুপুরির সারি। ছায়া।

গাড়ি দাঁড় করিয়ে বাজখাঁই হর্ন দিল মেজোমামা। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এলো একজন। লম্বা। ধপধপে ফর্সা রঙ। কাঁচায়-পাকায় বড় গোঁফ। পুরো পুলিশী কায়দায় স্যালুট দিল একখানা।

গেট খুলে দিল ছবি সিং। গাড়ি নিয়ে মেজোমামা সোজা ভেতরে। পিপুলের চোখ বারান্দায় আটকে গেল। ধূসর ধূসর একটা এ্যালসেশিয়ান বিরাট জিভ বার করে হাঁফাচ্ছে। ওর লালচে ছুচোখ বিশাল শরীর দেখে পিপুল একটু থমকাল।

কোনো ভয় নেই। নেমে আয়। ইবলিশ ইনোসেন্ট লোকেদের কিছু বলে না।

ঘুঙুরকে কোলে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল পিপুল। পেছনে বাবা মা। ডাঁউ ডাঁউ করে একটা বিচ্ছিরি হাঁক ছাড়ল ইবলিশ। গোটা চারেক ঝকঝকে দাঁত দেখতে পেল পিপুল।

আঃ! এরা আমার লোক। তুমি ঘরে যাও। মেজোমামার ভরাট গলায় চাপা পড়ল ইবলিশের ডাক। বাধ্য ছেলের মতোই মাথা নীচু করে ফিরে গেল ভেতরে। ওই স্যালুট করা ধপধপে ফর্সা রঙের মানুষটিকে সমান মেজাজে বলল মেজোমামা, ছবি সিং, গাড়ি সে সামান উতার লো।

গাড়ি থেকে মাল নামানোর কথা শুনেই ছুটল ছবি সিং।



মিউজিয়ামের ভেতর এক একটা জিনিসের সামনে থমকে থমকে দাঁড়াচ্ছে মেজোমামা। সেই মোম মাথায় নেয়া ব্রোঞ্জের দেবদূতকে তুলে ধরছে সামনের জিনিসের মুখের কাছে। তারপর আরতির ঢঙে আস্তে আস্তে নামিয়ে আনছে পা অব্দি।

গলা মোম কুলফি মালাই হয়ে ধীরে জমছে দেবদূতের ঘাড়ে ডানায়। বেশ লাগছে দেখতে।

দোতলায় এই এককোণে মামার মিউজিয়াম। কোণারকের সূর্যমন্দির—'ব্ল্যাক প্যাগোডা' এখান থেকে বেশ কিছুটা দূর হবে। সকালবেলা দোতলার খোলা বারান্দা থেকে স্পষ্ট নজরে পড়ে কোণারকের কালো চুড়ো। দোতলায় আছে আর ছ-খানা ঘর বাথরুম বারান্দা। দোতলায় শুধু থাকে মেজোমামা আর তার আট মাস বয়েসের ধূসর রঙের এ্যালসেশিয়ান ইবলিশ। যেমন নামের বাহার, তেমনি চেহারা, একেবারে সাক্ষাৎ শয়তান। ওর নামের বাংলা মানেও তাই। এটা মেজোমামার থেকেই জানা।

খুব ভালো জাতের কুকুর ইবলিশ। মেজোমামার ভাষায় পেডিগ্রি দারুণ। ওর বাবা ছিল কলকাতার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে ট্রেনিং নেয়া! আর ওর মা উড়িষ্যার রাজাদের আদরের ধন। অন্ধকারে একেবারে মিশে থাকে ইবলিশ। শুধু ওর ভাটার মতো লাল লাল চোখ ছুটো আঁধারে জ্বলে। একটা মস্ত বড় গোলাপি জিভ বের করে হাঁপায়। দেখলেই মনে হয় অরণ্যদেবের 'ডেভিল'কে।

ইবলিশের সঙ্গে ঘুঙুরের এখন বেশ ভাব জমে গেছে। প্রথম প্রথম ওকে দেখলেই তাড়া লাগাত ইবলিশ। কিন্তু ঘুঙুরের সঙ্গে দৌড়ে পেরে উঠবে কেন! তুরতুর করে এদিক ওদিক দিয়ে ঘুঙুর ঢুকে পড়ত খাটের তলায়। বড় বাক্স বা আলমারির পেছনে। অনর্থক হাঁপিয়ে মরত ইবলিশ। বোকার মতো জিভ বের করে ধুঁকত খুঁজে না পেয়ে।

এখন অবশ্য ঘুঙুরের সঙ্গে বেশ ভাব জমেছে ইবলিশের। ছুজনে প্রায় এক সঙ্গেই খায়, থাকে। ইবলিশ যখন হাঁউ হাঁউ করে শুধু হলুদ দিয়ে ফোটানো পাঁঠার টেংরির ঝোল দিয়ে মাখা ভাত খায়, ঘুঙুর তখন ওর পাশেই পিপুলের কোলে চড়ে খায় ছুধভাত। মাংস এক আধ টুকরো খেলেও সেটা বিশেষ পছন্দ নয়। ছুধভাত সবচেয়ে প্রিয় খাবার।

ইবলিশ ঘুঙুর ছাড়া থাকে বিকেলে। ঘুরে বেড়ায় সামনের বিশাল লনে। যেখানে আছে নকল পাহাড়, একটা ছোট্ট গুহা আর ঝরনা। সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চা একটা। তার মধ্যে লাল-নীল মাছ। পদ্ম ফুটে থাকে সেখানে। একজোড়া ছাড়া হরিণ আছে বাগানে। রাতের বেলা অবিশ্যি ওদের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেয়া হয়। আর আছে ছাড়া খরগোস, গিনিপিগ। খাঁচার ভেতরে সজারু, বেজি। খরগোস-গিনিপিগ নিজেরাই গর্ত খুঁড়ে বাসা বানিয়ে নিয়েছে। মাটির তলায় ওদের বাসা নাকি গোলকধাঁধার মতো। যদিও ওদের থাকার জন্যে অনেকগুলো মাটির কলসি পুঁতেছিল মেজোমামা, সেগুলো এমনিই আছে।

একটা তারের জালঘেরা জায়গার ভেতর আছে বদ্রি-মুনিয়া। টিয়া-চন্দনার জন্যে আছে আরেকটা খাঁচা। টিয়ার খাঁচার ভেতরও মাটির কলসি ফুটো করে দেয়ালে টাঙিয়ে দিয়ে বানানো হয়েছে বাসা।

পিপুলের সব দেখেশুনে কেমন যেন মনে পড়ে গেছিল মার কথা। মা বলেছিল, ছেলেবেলায় মেজমামার সেই শুঁয়োপোকা, মাছ আর শামুক পোষার কথা।

পিপুলের মাঝে মাঝেই মনটা যেন কেমন করে ওঠে বোনটি মিঠিমণির জন্যে। সবে দিল্লি আগ্রা এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ বেড়িয়ে ফিরেছে ওরা। কিন্তু এখানে এলে কি মজাই না পেত মিঠিমণি!

লম্বা গলাঅলা হলুদ ঠোঁটের দুধশাদা একজোড়া রাজহাঁস আছে মেজোমামার। ডিম দেয়। বেশ বড় ডিম। অবিশ্যি খেতে তেমন নয়। বড্ড পাজি হাঁস দুটো, বিশেষ করে ছেলে-হাঁসটা। চেহারায় ওটাই বড়। সুযোগ পেলেই ঘাড়-গলা নীচু করে তাড়া করে সবাইকে। ঠ্যাংয়ে কামড়েও দিয়েছে নাকি দু-একজনের প্রথম প্রথম এসে। এটা অবিশ্যি শোনা কথা পিপুলের।

হাঁস দুটোকে ভুলেও এই মাছের চৌবাচ্চায় নামতে দেয় না ঠাকুর বনমালি আর দারোয়ান ছবি সিং। নামলেই তো সব লাল-নীল মাছ শেষ। হাঁস দুটোর জন্যে আছে আলাদা একটা জলা মতন। সেখানে আছে তে-চোখা মাছ, গুগলি শামুক শ্যাওলা।

লাল-নীল মাছ আর পদ্ম-ফোটা চৌবাচ্চার ওপর আছে একটা মিহি তারের জাল, যাতে মাছগুলোর ওপর বক বা মাছরাঙা ছোঁ মারতে-না পারে। রাজহাঁস দুটোর নাম রাধা আর কৃষ্ণ।

ছেলে-হাঁসটা বড্ড দুষ্টু। সেদিন ঘুঙুর আর ইবলিশ বাগানে খেলছিল। ইবলিশের ল্যাজটায় একটা আলতো কামড় দিয়ে ঘুঙুর ছুট লাগাচ্ছিল গুহার ওপাশটায়। গরর্ করে একটা রাগী শব্দ তুলে ইবলিশ ধাওয়া করছিল ঘুঙুরের পেছনে। বার বার হাঁপিয়ে যাচ্ছিল, ধরতে পারছিল না। ঘুঙুর সুযোগ পেলেই ওর ল্যাজে কামড় দিচ্ছিল।

এরকম করে খেলতে খেলতে হঠাৎ দুজনে গিয়ে হাজির হয়েছিল জলার পাশে। হাঁস দুটো আপন মনে গুগলি খুঁজছিল। ঘুঙুরের পেছনে তাড়া করতে করতে ইবলিশ জলার ধারে যেতেই কৃষ্ণ, ছেলে হাঁসটা ঘাড় নীচু করে দৌড়ে এসে ইবলিশের ঠ্যাংয়ে এক পেল্লায় কামড়। ভাগ্যিস ইবলিশ ওর গলা কামড়ে ধরে নি। তাহলে তো খেল ওখানেই খতম হয়ে যেত।

মেজমামা নিজে এসে কৃষ্ণর ঠোঁট থেকে ইবলিশকে ছাড়িয়েছে। ইবলিশের চোখে করুণার চাউনি। যেন দুর্বলকে করুণা করছে এমন ভাব। সামান্য ছাল উঠে গেছিল ইবলিশের পেছনের ঠ্যাং থেকে।

নীল মাঠের ওপর দৌড়ে যাওয়া হলুদ ঘোড়সওয়ার ছাপ সোয়েটার পরে পিপুল দৌড় লাগিয়েছিল ফার্স্ট এড বক্স আনতে।

নিজে হাতে ইবলিশের ঠ্যাংয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে মেজোমামা। দুদিনেই পুরোপুরি ভালো হয়ে গেছিল ইবলিশ। এসব তরশুর ঘটনা।

দজ্জাল হাঁসটাকে কিছু বলে নি মেজোমামা। তবে ওকে আটকে রেখেছিল ছবি সিং খাঁচার ভেতর পুরো দুদিন—আটচল্লিশ ঘণ্টা। ছবি সিং প্রথম জীবনে আলিপুর প্রেসিডেন্সি জেলের সেন্ট্রি ছিল। ওর ভাষায়, আটচল্লিশ ঘণ্টা পুরা লকআপ। খাওয়াও কম দেয়া হয়েছিল। বাইরে একা একা ঘুরেছে রাধা। কেমন যেন মনমরা।

পিপুল নজর করে দেখেছে, একমাত্র দারোয়ান ছবি সিংকেই যমের মতো ভয় পায় কৃষ্ণ। সুযোগ পেলেই ও চলে আসে লাল-নীল মাছের চৌবাচ্চার কাছে। জালের বাইরে দিয়ে জুল জুল চোখে দেখে পদ্ম-ফোটা চৌবাচ্চা। যার মধ্যে পেটমোটা গোল্ডফিশ সাঁতরে বেড়ায়। লোভীর মতো চোখে তাকায় কৃষ্ণ। হলুদ ঠোঁট ঢোকাবার চেষ্টা করে জালের ফাঁক দিয়ে।

ছবি সিং দূর থেকে দেখতে পেয়েই, চিল চ্যাচান চ্যাচায়—এ বদমাশ বদ্‌তামিজ...। নিজের ভাষায় গালাগাল দেয়।

ওর গলার শব্দে কৃষ্ণ ভয় পেয়ে উল্টো দিকে দৌড়য়। একেবারে সোজা চৌবাচ্চা ছাড়িয়ে পালায়। মামার চৌবাচ্চার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পিপুলের মনে পড়ে যায় বাড়ির এ্যাকোরিয়ামের কথা। সেই সব এ্যালবিনো ল্যাকটেল ব্ল্যাকমলি সোর্ড টেল ওয়াক টেল প্ল্যাটি···।

মিঠিমণির ওপর এখন পুরো এ্যাকোরিয়ামের ভার। ওকে সব বুঝিয়ে এসেছে পিপুল। সাইফন করে কি ভাবে জল থেকে ময়লা তুলতে হবে। মেথিলিন ব্লু তিনফোঁটা করে দিতে হবে সপ্তাহে একবার। রোজ কেঁচো দিতে হবে টিউবে। কেঁচোর কলাইকরা বাটির জল পাল্টাতে হবে দিনে অন্তত দুবার। একটা ব্ল্যাক মলি বাচ্চা দিয়েছে। ব্যাটারির খালি বাক্সের ভেতর রয়েছে মা-বাচ্চা। পিপুল দেখে এসেছে। আজ নিয়ে নদিন হল। সাতদিনের দিন মা-ব্ল্যাকমলিটাকে আলাদা করে দিতে হবে। বাচ্চারা কেঁচো খেতে পারে না। ওদের জন্যে চাই ডাফনিয়া—একরকম জলের পোকা।

কে জানে মিঠিমণি সব ঠিকমতন করতে পারছে কিনা। ওর চিঠি এলেই সব জানা যাবে।

নীচের পুরোটা জুড়ে মেজোমামার রান্নাঘর, ঠাকুর বনমালি আর দারোয়ান ছবি সিংয়ের ঘর এবং বিশাল বাগান ও মিনি চিড়িয়াখানা। বাগানে এত সব জন্তু ছাড়াও আছে প্রজাপতি, ঘাস-ফড়িং, ফড়িং, নানান পাখি আর অজস্র ফুল। এখন শীতের সময় বাগান জুড়ে ফুটেছে গোলাপ আর নানা মরসুমী ফুল। এতো রঙ আর মিষ্টি গন্ধ কখনও এতো কাছ থেকে পিপুলের নজরে পড়ে নি।

বাগানের বাইরে কিছু দূরে বিশাল গেট। গেটের একদম ধার ঘেঁষে ছবি সিংয়ের আখড়া। রোজ সকালে মুগুর ভাঁজে ছবি সিং। বয়েস পঞ্চাশ ছুঁই ছুঁই। কুস্তি লড়ে ওর দেশোয়ালি ভাই বুধা সিংয়ের সঙ্গে। বুধা সিংয়ের বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশ। মস্ত কালো গোঁফ, মাথার চুল কদমছাঁট। রঙ ফর্সার দিকে। ছবি সিং বেশ লম্বার

দিকে। রঙ ধবধবে ফর্সা। বড় গোঁফ—কাঁচায় পাকায়। মাথায় চুল একটাও পাকে নি। বুধা সিং একটু বেঁটে।

রোজ সকালে উঠে সরষের খোল, কাঁচা হলুদ, শুকনো নিমপাতা দিয়ে তৈরি ঝুরঝুরে নরম আখড়ায় তেল মেখে দুজনে কুস্তি লড়ে। একটা বাচ্চা বটগাছের মাথায় ওড়ে লালরঙের তেকোণা ঝাণ্ডা। তার ওপর শাদায় আঁকা মহাবীর—বজরঙ্গবলী। সিঁদুর মাখানো নুড়ি-পাথর আছে একখানা। ছবি সিং, বুধা সিং হাতজোড় করে বলে—মহাবীরজী।

ঠাকুর বনমালি এসব ব্যাপারে নেই। উড়িষ্যারই লোক। বয়েস চল্লিশ পেরিয়েছে। বিয়ে-থা করে নি। দেশে ওর বুড়ি কাকি আর তার ছেলেরা আছে। সেখানেই টাকা-পয়সা পাঠায়। বছরে দুবার ছুটি নেয়। একবার পুজোয় আর একবার রথে। বুড়ি কাকিমাকে নিয়ে পুরী যায় সমুদ্রে চান করতে, জগন্নাথ দর্শন করতে। ঠাকুর বনমালি ছাড়া আছে চাকর বিশ্বনাথ আর মালি গতি।

বনমালির রঙ কালো। মাথায় তেল চকচকে টাক। গায়ে একটা পৈতে। খালি গায়েই থাকে বলতে গেলে সব সময়। কেবল শীতের দিনে গেঞ্জির ওপর মেজোমামার দেয়া একটা তুষের চাদর জড়ায়। বয়েস অনুপাতে ওকে বেশ বড় লাগে। শুকনো পাকানো মতো চেহারা। রান্নায় বড্ড ঝাল দেয়। তাই মা এখানে এসে দায়িত্ব নিয়েছে রান্নার। এখন ছুটি বনমালির, খালি ডাল রাঁধে।

রোজ সকালে উঠে কুস্তি লড়ে, ভজন গায় ছবি সিং-বুধা সিং। দেশোয়ালি ভাষায়—প্রভুজী তুম বিনু হাম···। দূরে তখন পুব আকাশে কেউ আবির কুমকুম গোলা ছড়িয়ে দেয়। ঘুম ভেঙে যায় পিপুলের। তখন নিজের ঘরের ভেতর স্নানটান সেরে বনমালি করতাল বাজিয়ে গায়—প্রভু জগরনাথও দীননাথও···।

দুটো সুর কেমন যেন মিলেমিশে একটা অদ্ভুত আমেজ তৈরি করে সুড়সুড়ি দেয় পিপুলের কানের ভেতর। যেন বলে, ওঠ, বেলা যায়।

মনে পড়ে যায় বৃন্দাবনের লালাবাবুর গল্প। র‍্যাপিডের ক্লাসে গোবিন্দবাবু পড়াতেন। এই 'ওঠ বাবা বেলা গেল' শুনেই লালাবাবু সন্ন্যাসি হয়ে গেছিলেন। পিপুলের চোখ কেমন ভিজে ওঠে। তারপর আছে এ্যারয়ের বেহালা।

দোতলার মাথার ওপরে একমাত্র ঘর—চিলেকোঠায় থাকে এ্যারয়। সাতাশ আটাশ বছরের ফরাসি ছেলে। উজ্জ্বল ঝকমকে চেহারা। ভারতের সমস্ত মন্দির সম্বন্ধে আগ্রহী। পূর্ব-ভারত দিয়ে শুরু করেছে। প্রথমেই উড়িষ্যা।

লেনিনের মতো দাড়ি গোঁফ এ্যারয়ের মুখে। মাথার চুল কটা—ঘাড় অব্দি। অদ্ভুত ঠাণ্ডা শান্ত মানুষ। এমন কি হাসিও শব্দহীন। গায়ের রঙ দারুণ ফর্সা। একদম সেই মেজোমামার রাজহাঁসের মতো। গাঢ় রঙের জামা পরতে খুব ভালোবাসে। ওকে মানায়ও খুব। বড় ভালো হাত বেহালায়।

ওর সঙ্গে অল্পই আলাপ হয়েছে পিপুলের। মাস নয়েক হল আছে এখানে। বাংলা এবং ওড়িয়া দুটো ভাষাই শিখছে আস্তে আস্তে। সত্যজিৎ রায়, সুভাষচন্দ্র বসু, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, সবার নাম জানে। ইচ্ছে আছে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা ফরাসিতে অনুবাদ করে বই করবে। বড্ড ভালো গলা। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করে —ক্লান্তি আমার ক্ষমা কর প্রভু।

রেকর্ড শুনে শুনে রবীন্দ্রনাথের গানও গাইতে চেষ্টা করে। বড় মজার কথা বলে এ্যারয়। বলে, সব কিছুর মধ্যেই সুর আছে। সকাল বেলায় বাগানে যে পাখি ডাকে, হুমহাম শব্দে ছবি বুধা যে কুস্তি লড়ে, সবার ভেতরে আছে এক দারুণ সিম্ফনি—সুর। টেপ নিয়ে ও চলে যায় তাই দূরে। ব্যাটারির টেপে ধরে নিয়ে আসে নানান শব্দ। তারপর টেপ চালিয়ে বেহালায় সেই সুরগুলোকে তোলার চেষ্টা করে।

এ এক অদ্ভুত পাগলামি মনে হয় পিপুলের কাছে। একদিন

এ্যারয় ইবলিশ আর ঘুঙুরের ঝগড়ার সুর শুনিয়েছে পিপুলকে। মন্দির ছাড়াও এ ব্যাপারে এ্যারয়ের দারুণ উৎসাহ।

ব্রোঞ্জের দেবদূতের মাথায় আলো দেয়া সেই আশ্চর্য মোম কখনও কখনও কেঁপে উঠছে হাওয়ায়। জানলা দিয়ে আসা বেদুইন বাতাসের ধাক্কায় দুলে ওঠা, নড়ে ওঠা নরম নরম হলুদ আলোয় দেয়াল জুড়ে মস্ত মস্ত ছায়া। যেন হাঁ করে গিলতে আসে। মেজোমামার ছায়াও ঘরের ছাদ ছুঁয়েছে।

পিপুলের আশেপাশে অবাক হওয়ার মতো সব মূর্তি। যেন কোনো প্রাচীন রোমান বা গ্রীক যোদ্ধারা। তাদের পোশাক-আশাক, বর্ম-বল্লমে, তলোয়ারে মোমের আলোর কারুকাজ। মনে হচ্ছে এই বুঝি ছুটে যাবে কেউ। ঘোড়ার মুখ থেকে বেরিয়ে আসবে হ্রেষারব। হা-হা শব্দে ভেঙে যাবে নিথর রাত্রি।

দেখতে দেখতে পিপুল ভাবে কত কষ্ট করেই না এইসব পাথর আর ব্রোঞ্জের মূর্তি সংগ্রহ। সারাজীবনই এর পেছনে পেছনে।

শুধু মূর্তি নয়, অজস্র পুরনো যুগের পানপাত্র, বাসনকোসন, জামা-কাপড়, স্টাফ করা ছোট জানোয়ার, পাখি। ঘরের পর ঘর। সেই ডানা মেলা মরা ঈগল, যার ঠোঁটে-নখে গেঁথে আছে একটি বাদামি পায়রা। ঈগলের ঝাপটে ওঠা কালচে-সোনালি ডানায় সহস্র বর্ষের রাজ্যজয়ের অহংকার। তার ঠোঁটে-নখে শিকারি মণিতে আদিম লাস্য। আর বিবর্ণ, মৃত পায়রা যেন কোনো নতজানু প্রজা।

সাপ আর বেজিও এভাবেই সাজানো। কাঠবেড়ালি, ছোট বাঘ, হরিণ আর নানান পাখিও। তাদের ডানা আর চামড়ার বর্ণময়তা এই কমে আসা আলোয় বড় মায়াবী।

কি রকম যেন গা-গুলনো গন্ধ এই সব মরা জীব-জানোয়ারের গা থেকে উড়ে আসছে। ভাল্লাগছে না।

অনেক, অনেকদিন আগের নানান ধরনের পয়সা, ছবি, অস্ত্রশস্ত্র।

মূর্তির ঘরে—যেখানে শুধুই বড় বড় মূর্তি আছে রাখা, সেখানে আবার ফিরে আসে মেজোমামা—কি এক টানেই। সেই প্রাচীন গ্রীক রোমান যোদ্ধা, সুন্দরী রমণীরা, নৃত্যরতা দেবদাসী বা মৃদঙ্গবাদিকা, কষ্টিপাথরের বিষ্ণুমূর্তি এবং ব্রোঞ্জের ঢাউস গণেশ—সব, সব কিছুই আলোয়-ছায়ায় জড়ামরি করে ভেঙেচুরে দ। তাদের কিম্ভুত ছায়ারা মিলেমিশে আরও অদ্ভুত, অপার্থিব।

হঠাৎ একটু ভেতরে ঢুকে প্রায় মানুষ সমান গ্রীক যোদ্ধার সামনে দাঁড়িয়ে মোমবাতি তুলে ধরল মেজোমামা।

বিস্মিত পিপুল সেই যোদ্ধার বিশালতার সামনে প্রায় নুয়ে যেতে চাইল। বুকের ভেতর কি এক ভয়ের বাজনা—দ্রিমি দ্রিমি···।

বিশ্বাস কর, আলেকজাণ্ডারের বর্শা এইখানে। এই হাতে।

পিপুলের শিরদাঁড়ার ভেতর হিমালয়ের বরফ। পা চলতে চাইছে না। মনে পড়ে যাচ্ছে, ৩৩০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পারস্য সম্রাট দারিউসকে হারিয়ে ৩২৭ খ্রীস্টপূর্বাব্দে হিন্দুকুশ পর্বত পেরিয়ে ঢুকে পড়েন ভারতে।

তারপর হাজার হাজার ঘোড়ার কেশর ফোলানো চিৎকার শুনতে পায় পিপুল। তাদের ধারালো খুরের ট্রলপ ট্রলপ···। ধুলো উড়ছে। একে একে পরাজিত হচ্ছে পার্বত্য জাতিরা, রাজা অষ্টক, বশ্যতা স্বীকার করে নিচ্ছে অম্ভি···কেবল একলা দাঁড়িয়ে আছেন পুরু। বিতস্তা আর চন্দ্রভাগার মাঝখানে তাঁর স্বাধীন, মাথা উঁচু করা রাজত্ব। যিনি হিদাস্পিসের যুদ্ধে বন্দী হওয়ার পরও আলেকজাণ্ডারের সামনে বুক টান করে বলেছিলেন, রাজার প্রতি রাজা যেমন ব্যবহার আশা করেন, আমিও তেমনি ব্যবহার আশা করি আপনার কাছ থেকে।

হাজার ঘোড়ার পায়ের শব্দ, ধুলোর ঘ্রাণ নিমেষে মিলিয়ে যায়। মেজোমামা ডান হাতে মাথায় মোম জ্বলা দেবদূত তুলে বাঁ হাতে বর্শার হাতল ছুঁয়ে ফেলে। বিশাল বর্শা আলতো আলোতেও ওঠে ঝিকিয়ে। সৈনিকের পায়ের পাতার কাছ থেকে প্রায় বুক ছাড়ানো সেই ঐতিহাসিক আয়ুধ এই আধো অন্ধকারে প্রায় জীবন্ত।

মামা বলে উঠল, অনেক দিন ধরেই ভাবছি একটা ক্লাম্প করে আটকে দেব বর্শাটা ওই সৈনিকের হাতের সঙ্গে। বহুদিন ধরেই ভাবছি···। চারপাশে যেরকম চুরি-টুরি···।

ভাবনার ঘরে চাবি।

এক ধাক্কায় পিপুল মাটিতে।

নিভে গেল আলো। ধড়াম ধুড়ুম শব্দ। মামার শেষ কথা কটা বাতাসে ভেসে বেড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো, আউফ্···। আর তার ভারি শরীর পড়ে যাওয়ার শব্দ।

ব্রোঞ্জের দেবদূত একটা ভোঁতা আওয়াজ তুলে মাটিতে গড়াগড়ি। তার শেষ আলোটুকু গাঢ় অন্ধকার আর নানান মাপের ছায়া লাগা দেয়ালের গায়ে ধূমকেতুর ল্যাজ হয়েই যেন মিলিয়ে গেল।

ঘড় ঘড় করে কি একটা টানাটানির আওয়াজ। পায়ের দুপদাপ দৌড়ে যাওয়া।

দরজা হা-হাট। বাতাসে ধপাস ধপ শব্দ তুলে তার দেয়ালে আছড়ে পড়া। তারপর ইবলিশের চিৎকার···। চিৎকার···।

মেঝে থেকে ধুলো ঝেড়ে উঠতে উঠতে পিপুল ভাবল সে তার পেন্সিল টর্চ নীচে রেখে এসেছে।

বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছটায় বোধহয় নুনছাল উঠে গেল। জ্বালা করছে। বাঁ হাঁটুতেও লেগেছে। মনে হচ্ছে মচকেছে ডানপায়ের কড়ে আঙুলও। মাথার পেছনেও ব্যথা—।

এই অন্ধকারে এই বড় মূর্তিশালার ভেতর একটি মাত্র জোনাকি। যেন আকাশ থেকে কোনো তারা হঠাৎই ঢুকে পড়েছে এইখানে।

একটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই একেবারে মাটির ওপর দুপায়ে সোজা পিপুল। পিঠে বেশ জোরে থাপ্পড় মেরে মেজোমামা বলল, ঘাবড়াস না। ফার্স্ট রাউণ্ডে হেরে গেলেও সেকেণ্ড রাউণ্ডে ছাড়ছি না।

তারপর পিপুলকে নিয়ে হিঁচড়ে বারান্দায়।

সিঁড়ির মুখে হাতে ঝোলানো ব্যাটারি-টর্চ নিয়ে ছবি সিং, বুধা সিং। কাঁধে লাঠি। সাব—

রুখ্ যাও।

ছবির হাত থেকে ব্যাটারি টর্চ নিয়ে বারান্দা দিয়ে ঝুঁকল মামা। দোলানো আলোয় অন্ধকার কাটল। যতদূর আলো যায়, কোনো গোলমাল চোখে নেই। ঘাস, বৃক্ষরা স্থির। শুধু চেনে বাঁধা ইবলিশ চেন ছেঁড়ার মেজাজে চেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ইবলিশ কো ছোড় দো।

ঘুঙুরের একবার পাত্তাটিও নেই এ সময়, এত রাগ হচ্ছিল পিপুলের। বড় আরামি, ভিতু আর কুঁড়ে ঘুঙুর। মেজোমামা সত্যি সত্যি বলে, ওটা কুকুর না খরগোস!

মেজোমামা আবার আলো মেলে দেয় উঠোনের ওপর। ইবলিশ ছাড়া পেয়ে ছুটে যায় সেই লোহার গেট অব্দি। তার গলায় বাঘের ডাক, কিংবা অরণ্যদেবের ডেভিলই হয়ত বা।

অনেকক্ষণ ধরে ইবলিশের চিৎকার মিশে যায় কোণারকের আকাশে, মেঘে। বারান্দা থেকে আলো দোলাতে দোলাতে মেজোমামা সিগন্যাল দিয়ে ইবলিশকে ডাকে। রাগী জানোয়ার অনিচ্ছাসত্ত্বেও আসে ফিরে।

মূর্তিঘর বন্ধ করে মেজোমামা। চাবি লাগায়। আর তখনই আলো আসে। সমস্ত বাড়ি ঝলসে ওঠে বিদ্যুতের বন্যায়।

মেজোমামার সঙ্গে একতলায় নেমে পিপুল দেখে তিনতলায় এ্যারয়ের ঘরে আলো জ্বলছে। সতর্ক হয়ে শুনলে শোনা যাবে—ওখান থেকে ভেসে আসছে ক্লিফ রিচার্ডের গান। এত গোলমালও এ্যারয়কে নামাতে পারে নি।

উঠোনে রীতিমতো উত্তেজনা।

বাবা-মা, ছবি সিং বুধা সিং, বনমালি, বিশ্বনাথ, গতি, আর সবাইয়ের মধ্যিখানে ঘুঙুর। পিপুলকে দেখেই ঘুঙুরের আহ্লাদ···।

দুপায়ে ভর দিয়ে, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে হাত-মুখ চাটার চেষ্টা···।

পিপুল এখন একটুও লাই দেবে না ওকে। বিপদের সময় কোথায় ভেগে ছিল ভিতুটা!

মায়ের মুখে চোখে ভয়ের ঢেউ। এই সন্ধ্যের মুখে মা বোধহয় একটু ধ্যানে বসেছিল, আচমকা উঠে এসেছে। মামাকে দেখে কেঁদে ফেলে আর কি। বাবারও সেই দশা। সবার গায়েই তেমন কোনো চাপা চুপি নেই। উত্তেজনায় কোথায় যে পালিয়েছে শীত!

ব্যাপারটা সামলাতে গেল বেশ কিছুক্ষণ। মামাই সান্ত্বনা দিল সবাইকে। —কোনো ভয় নেই। চিন্তা করারও নেই কিছু। দেখছি সব—

আদত ব্যাপারটা কি হয়েছে, তা অবিশ্যি এখনও কেউ জানে না। সবাই এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি। মামা ছবি আর বুধাকে বলল, শোন, উঠোনের সব ফ্লাডগুলো জালিয়ে দে! আর সারা রাত জ্বেলে রাখ। আমি একবার ওপরে যাচ্ছি।

দোতলার ছ-খানা ঘরের চারটেতে মামার মিউজিয়াম, লাইব্রেরি। একটায় থাকে মামা। অন্যটা থাকে বন্ধই। পিপুলরা আসার পর মা-বাবা এক ঘরে। মেজোমামার ঘরেই পিপুল।

দোতলায়, যে ঘরে ওরা দুজন ছিটকে পড়েছিল একটু আগে, তার চাবি খুলল মেজোমামা। লাইট জ্বালল, সেই বিশাল মূর্তিরা আলো মেখে তেমনই স্থির, নিস্পন্দ। কেবল সেই গ্রীক যোদ্ধার হাতের বর্শাটি নেই।

পিপুল কিছু বলার আগেই কোথায় যেন ডেকে উঠল টিকটিকি। একবার নয়, পরপর তিনবার। মামার মুখে কথা নেই। তবু পিপুল দেখল তার চোয়ালে দৃঢ়তার ঢেউ উঠেই গেল মিলিয়ে।

মূর্তিঘরের সেই সব আশ্চর্য স্ট্যাচু তেমনিই চুপচাপ। কোথাও কোনো শব্দ নেই। নীচু হয়ে মেঝে থেকে মুখ থুবড়োনো দেবদূত

চেহারার মোমদানি তুলল মামা। তার ডানায় পড়ে যাওয়ার থ্যাঁতলানো দাগ। গলা মোম ছড়িয়েছে মাটিতেও। এছাড়াও আরও একটা কি যেন সন্তর্পণে কুড়ল মামা। তারপর লাইট নিভিয়ে দরজায় তালা দিয়ে পিপুলকে বলল, চল।



ঘুম ভাঙল মেজোমামার ঘরেই। বিছানা থেকে উঠতে উঠতে বেশ বেলা। রোদ তখন সোনালি চাদর হয়ে সমস্ত চরাচরে। কালকে পড়ে যাওয়ার ব্যথা এখনও ছড়িয়ে আছে সারা শরীরে। কেমন আড়ষ্ট ভাবে।

গায়ের ওপর পাতলা চাদর ছিল। তবুও পিপুলের মনে হল পায়ের পাতার নীচে কেমন যেন ভিজে ভিজে অস্বস্তি। পা নাড়তেই সব চুপচাপ। তারপর আবার যে কে সেই। ঘুঙুর যে এভাবে পা চাটাচাটি করতে পারে, প্রথমে বুঝতেই পারি নি। এখন বুঝতে পেরে একটু বিরক্তও! তবু কিছুই করার নেই। বিছানার চাদরের ভেতরই আছে ঘুঙুর।

শুয়ে শুয়েই পিপুলের মনে হল, কালকের সমস্ত ঘটনা ডায়েরিতে লিখে রাখা দরকার। আর গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে বিবি আর মিঠিমণিকে চিঠি দিতে হবে একটা।

সারা ঘরের দেয়ালে সকালের রোদের অন্যরকম নকশা। যে সিঙ্গল খাটে শুয়ে পিপুল, তার পাশের সিঙ্গল খাটে মেজোমামা।

বিছানার ওপর বসা। বন্দুক পরিষ্কার করছে খুব যত্ন নিয়ে। তেল, লম্বা লোহার শিক, ন্যাকড়া—সব নিয়ে একাজে তার বড় মনোযোগ।

মেজোমামার এই ঘরে, দেয়ালে দুটো বন্দুক। বারো বোরের, দোনলা। একটা রাইফেল, দুটো বড় ভোজালি আর একটা তলোয়ার টাঙানো আছে দেয়ালে—সব কিছুই সেই রয়্যাল আর্মিতে থাকতে থাকতেই।

দুটো বন্দুক আর ভোজালি দুটো ছবি বুধার। তেমন কাজে লাগে না বলে রাখাই থাকে মেজোমামার ঘরে, আর মাউজার পিস্তলও। মাঝখানে ৭০-৭৬ সালে সমস্ত বন্দুক জমা করা ছিল থানায়। এখন আবার তা ফেরত এসেছে।

চোরা রোদ এসে পড়েছে বিলিতি ডবল ব্যারেলের ওপর। তার ফলে কি রকম একটা মেঘলা মতন আলো সেইখানে।

দোরগোড়ায় টান টান হয়ে শুয়ে ইবলিশ। চেন ছাড়া। কাউকে ঢুকতে হলে তাকে ডিঙিয়েই আসতে হবে।

আড়মোড়া ভেঙে বিছানার ওপর উঠে পিপুল দেখল মেজোমামা উঠে দেয়াল থেকে পেড়ে আনল ভোজালি। হাতির দাঁতের হাতল। ঢাকনার ওপর সোনালি জরির কারুচিত্র। রোদ সেখানে পড়ে কেমন যেন চঞ্চল। তার প্রতিফলন দেয়ালে।

বিছানায় উঠে আড়মোড়া ভেঙে, সোয়েটার মাথায় গলিয়ে নিতেই মেজোমামা উঠে এসে ওর হাতে ধরিয়ে দিল ভোজালি। বলল, সাবধানে রাখ। সব সময় কাছে রাখবি, আর দরকার পড়লেই···।

শিরদাঁড়ার ভেতর আবার বরফ জমতে শুরু করেছে পিপুলের।

কোনোরকমে ভোজালিটা হাতে ধরে বিছানায় নামিয়ে রাখতেই শুনতে পেল মেজোমামার গলা—কি রে, অত ভয় পাচ্ছিস কেন ? অত ভয় পাওয়ার কি আছে ? প্যাণ্ট পরার পর একটা ক্রসবেল্ট দেব। তার সঙ্গে ঝুলিয়ে রাখবি কোমরে ···। সময় ভালো বুঝছি না।

নীচে থেকে হঠাৎই উঠে এলো ছবি সিং দোতলায়। স্যর্, যাবেন না থানায়?

মেজোমামা ঘাড় নাড়ল। যাবে।

তারপর আপন মনে বন্দুক পরিষ্কার করতে করতে বলে চলল, পিপুল, বর্শাটা সত্যি সত্যি আলেকজাণ্ডারের কিনা, তার কোনো প্রমাণ আমার কাছে নেই। এটা কিনেছিলুম ইরান থেকে। তখন সবে সেকেণ্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মিটেছে। কয়েকটা দেশ ঘুরে ভারতে ফিরব। এমন সময় ইরানের রাস্তায় একদিন সন্ধ্যেবেলা।

আমাদের আর্মির বন্ধু পেরেরা এসে খবর দিল, দারুণ একটা জিনিসের খবর পেয়েছে এখানে। জিনিসটা যেমন দেখার,তেমনিই রাখার।

সেদিনের কথা আমি ভুলতে পারব না। অনেক, অনেক রাস্তা হেঁটে গলি ঘুঁজি পার করে একটা নড়বড়ে বাড়ির সামনে পৌঁচেছি। দেখলে মনে হবে একটু হাওয়া দিলেই বুঝি পড়ে যাবে বাড়িটা। তার ভেতর দিকে একটা অনেকগুলো খিলানঅলা সুড়ঙ্গ পেরিয়ে আরও কিছু এগিয়ে যাওয়া।

তারপর কালো আলখাল্লা পরা এক শরীর। হাতে মোমবাতি। মোমের আলো সেই পোশাকের অন্ধকারকে আরও উজ্জ্বল করেছে। তার পেছন পেছন একটা পুরনো ঘরে গিয়ে সামান্য টাকায় কোনো দরাদরি না করেই প্রায় কিনে ফেলেছিলাম এই বর্শা।

সেই আলখাল্লা মোড়া মানুষ বলেছিল, এ বর্শা আলেকজাণ্ডারকে দিয়েছেন দেবরাজ জিউস। কোনো না কোনো একদিন এটা ফেরত যাবে তাঁর কাছে। আমি দানিকেন মানি নে। ঠাকুর-দেবতা, কোনো গাঁজাখুরি, গুলতাপ্পি, গ্রহান্তরের মানুষ নিয়েও আমার মাথাব্যথা নেই। তবু সেই পরিবেশে গা কেমন যেন উঠেছিল ছমছমিয়ে। বেশ ভারি, ওজনদার বর্শাটা ছিল দুভাগ করা। আমি জোড়ার পদ্ধতি দেখে নিয়ে দুভাগ আলাদা আলাদা করেই বেরিয়ে এসেছিলাম। এই সব মূর্তি সংগ্রহ হয়েছে তারও অনেক পরে।

কিছুই মানি নে আমি। তবুও কেন জানি না, মিশরের পিরামিড, তাজমহল, কোণারকের মন্দির, গ্রীসের প্রাচীন স্থাপত্য দেখে প্রশ্ন আসে—কে বানাল এদের? আলেকজাণ্ডারের বর্শা আদৌ আলেকজাণ্ডার বা কোনো গ্রীক সৈন্যের কিনা, তা খতিয়ে দেখি নি। আমাকে মুগ্ধ করেছিল ওর ইতিহাস নয়, চেহারা। দারুণ ঝকঝকে ভারি বর্শা। হাতলে গম্ভীর কারুকাজ—নানান পাথর, মিনে। মিলিয়ে মিলিয়ে শেষ অব্দি এক গ্রীকসৈন্যের মূর্তির হাতেই···।

পিপুলের গায়ে সোয়েটার। রোদ বিছানার দখল নিয়েছে অনেকখানি। ঘড়ি দেখে মেজোমামা বলল, শোন, আমি একবার হোল ব্যাপারটা রিপোর্ট করার জন্যে থানায় যাব। বেশ দূর আছে। যাব জিপে। থানার দুজন সাব ইন্সপেক্টর—শুকদেব বিশাল আর মূরলীধর রথ আমার খুব বন্ধু। ব্যাপারটার একটা ইনভেস্টিগেশান হওয়া দরকার। তুই বাড়ির চার্জে থাক। আমি বন্দুক দুটো দিয়ে যাচ্ছি ছবি আর বুধাকে। ঘাবড়াস না। ইবলিশ রইল, ওর চেন খোলাই আছে।

চাদরের নীচে ঢুকে ঘুঙুর যথারীতি দুষ্টুমি করছে। পা চাটছে, আঙুল কামড়াচ্ছে।

মেজোমামা উঠে পড়ল। তারপর জামাকাপড় পরে এসে ভারি মাউজার নিল হাতে।

পিপুল বলল, তুমি একলা, একলা!

মাউজারে হাত বুলোতে বুলোতে মেজোমামা বলল, কি আছে, একলাই গাড়ি চালিয়ে যাব। আর তেমন কিছু হলে তো লোডেড মাউজার···।

বাইরের রোদ তখন ঝাপিয়ে পড়েছে দেয়ালে টাঙানো শুকনো বাঘের মাথার হাঁ করা মুখের হলুদ হলুদ দাঁতে, বাইসনের ধারালো কালচে শিঙে। সেদিকে তাকালেই বুকের তলায় শিরশিরানি

পিপুল নীচে জিপ স্টার্টের শব্দ শুনতে পেল।



কালকের ঘটনার পর এই প্রথম ফাইভ স্টার চিবোচ্ছে পিপুল।

সামনে খোলা ডায়েরি। একটু আগেই আলাদা আলাদা চিঠি লিখেছে মিঠিমণি আর বিবিকে। ডাকে দিতে যেতে হবে জিপে চড়ে। ডায়েরির পাতায় এক জায়গায় এসে আটকে গেছে কলম। বর্ণনা এরকম—'বুঝতে পারলুম না কি ভাবে যেন একটা ঝড় এসে পড়ল আমার ওপর। উড়েই প্রায় পড়ে গেলুম মাটিতে। মেজো-মামার হাত থেকে ছিটকে পড়ল মোমবাতি ঘাড়ে নেয়া সেই ব্রোঞ্জের দেবদূত। সারা ঘরে অন্ধকার।'

এই অব্দি লিখে আর কলম চাইছে না এগোতে। তারপর ব্যথা লাগার বিবরণ কিভাবে দেবে ভাবছে।

বাইরে দশটা বেলার রোদ। মামা এখনও ফেরে নি থানা থেকে। দরজার সামনে টান টান শোয়া ইবলিশ। বিছানার ওপর কুণ্ডুলি পাকানো ঘুঙুর।

একটু আগে নীচে থেকে জলখাবার খেয়ে এসেছে পিপুল। লুচি আর আলুভাজা। তারপর হালুয়া। হালুয়ার ভেতর কিশমিশ।

মা-ই করেছে সব। যদিও মন-মেজাজ কারুরই ভালো নেই তেমন।

গোটা বাড়িটা চুপচাপ। দূ-রে, দূর থেকে ভেসে আসছে অজানা পাখির ডাক, আর বুনো ফুলের গন্ধ।

হঠাৎ দরজায় টোকা। আর সঙ্গে সঙ্গে ইবলিশের আকাশ ভাঙা চিৎকার।

দরজার কাছে এ্যারয়। ডাকাডাকি, চিৎকারে গা-ঝাড়া মেরে উঠে বসেছে ঘুঙুর, বিছানায়।

পিপুল বিছানা ছেড়ে উঠে বলল, এসো।

এ্যারয় বাইরেই দাঁড়িয়ে। তার ডান হাতে একটা ছোট ব্যাণ্ডেজ।

ইবলিশ এ্যারয়কে ঢুকতে দিতে চাইছে না। এ্যারয় তাই বাইরে থেকেই—।

স্টপ ইবলিশ, স্টপ। পিপুলের গলায় ধমক।

গোঁ গোঁ করতে করতে ইবলিশ বসে যায়। গা শোঁকে এ্যারয়ের।

কাম অন এ্যারয়।

নীল হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবির ওপর হালকা বাসন্তী রঙের চাদর। শাদা পাজামা। মুখে দুষ্টু দুষ্টু হাসি।

পিপুল ডায়েরি বন্ধ করে বসতে বলল এ্যারয়কে বিছানাতেই। এ্যারয়ের বাঁ হাঁতে খুব ছোট একটা বিদেশী টেপ রেকর্ডার। বসতে বসতে বলল, তোমাকে একটা নতুন সিম্ফনি শোনাই। কাল অনেক অনেক দূরে জঙ্গলে গেছলাম। এমন শীত, পাতা ঝরছে। সেই পাতা পড়ার শব্দ, হাওয়ায় ভেসে যাওয়ায় এক নতুন সুর।

এ্যারয় টেপ চালু করল। খুব ধীরে কোনো শব্দ যেন উঠে আসছে। শোঁ শোঁ, ঝির ঝির ঝির, খস্ খস্ খস্। কেমন গম্ভীর, অথচ মন কেমন করা···।

পিপুল এই মানুষটিকে যত দেখে, তত অবাক। কি আশ্চর্য ধৈর্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। দিনের পর দিন।

তারপর টেপ থামিয়ে ক্যাসেট চেঞ্জ করে। ঘুঙুর ঘাড় বেঁকিয়ে বিচ্ছিরি মুখ করে ওকে দেখে। চুপচাপ।

তোমার হাতে ব্যাণ্ডেজ কেন ?

কালকের একটা ছোট এ্যাকসিডেন্ট—। ও কিছু নয়।

নতুন ক্যাসেট বাজে।

এ্যারয় বলে, একটু দূরে একটা পুরনো মন্দিরের ভেতরেও কাল গিয়েছিলুম। কি আশ্চর্য হাওয়া। চারপাশে ঝুরঝুরে বালি। ভাঙা মন্দির। মন্দিরের ভেতর দিয়ে হাওয়া চলছে, মনে হচ্ছে যেন দীর্ঘশ্বাস নিচ্ছে কেউ, বুক ভাঙছে কারোর। আকাশে চাঁদ ছিল। শীত পড়েছিল জাঁকিয়ে। কুয়াশার পরদা ছিঁড়ে যে জ্যোৎস্না বার বার পৃথিবীতে পৌঁছচ্ছিল, তার রঙে নেশা হয়ে যায়। আমার মনে হচ্ছিল এই পুরনো, দেবতা-বিহীন ভক্ত না আসা মন্দির একলা কাঁদছে। যেমন কাঁদে একলা পাখি, একলা মানুষ।

টেপ শুনতে শুনতে পিপুল সত্যি সত্যি ভাঙা পাথরের ভেতর দিয়ে হাওয়ার বয়ে যাওয়ায় এক নতুন উপলব্ধির জগতে পৌঁছে যায়। ওর মনে হয়—এ্যারয় কবিতা লেখে না কেন !

পুলিশের পোশাক না পরেই এলো সাব ইন্সপেক্টর বিশাল আর রথ। জিপের শব্দ আর মোটর সাইকেলের আওয়াজ পেয়ে পিপুল আন্দাজই করেছিল মামা এলো সঙ্গে—। এ্যারয়ের টেপে তখনও পাথরের বুক থেকে ওঠা দীর্ঘশ্বাসের সিম্ফনি শেষ হয় নি।

ইবলিশ গা ঝাড়া দিয়ে দোড়গোড়ায় একবার ডেকে উঠতেই মেজোমামার ধমক—স্টপ, সিট ডাউন !

বিশাল এবং রথ তুজনেই বাংলা বুঝতে পারে। টুটা ফুটা বলতেও পারে। ওদের তুজনের জন্যে তুটো চেয়ার আনতে হাঁক দিল মেজোমামা। সঙ্গে চা আর হেভি ব্রেকফাস্ট।

মাঝারি চেহারার তুজন সাব ইন্সপেক্টরেরই বয়েস কম। কোমরে একটু ভুঁড়ি মতো, নাকি উঁচু হয়ে আছে লুকনো রিভলবারে !



ওঁদের দুজনকে দেখে এ্যারয় সব গুটিয়ে উঠে পড়তে চাইছিল। মামা বলল, যেও না, বোসো। থতমত খেয়ে বসল এ্যারয়।

আগে খেয়ে নি, তারপর কাজের কথা। মামার কথা শেষ না হতে হতেই হেভি ব্রেকফাস্ট। ডবল ডিমের ওমলেট, কড়া স্যাঁকা চারটে করে টোস্ট, আর বড় কাপে কফি। এ্যারয় শুধু কফি নিল। পিপুল কিছুই না।

খেতে খেতে কালকের ঘটনা খুঁটিয়ে বলল মেজোমামা।

মুখ চালাতে চালাতে ছোট নোট বুকে নোট নিচ্ছিল রথ। তাকাচ্ছিল ঘরের চারপাশে। কথা শুনতে শুনতে এ্যারয় তো হ্যাঁ!

পিপুলের সঙ্গে দুই পুলিশের ভালো মতো আলাপ করিয়ে দিল মামা, আমার ভাগ্নে, গ্রেট পিপুল। কালকের ঘটনার সময় ছিল আমার পাশে। ওরা দুজনেই শেক হ্যাণ্ড করল পিপুলের সঙ্গে।

বিশাল বলল, চলো স্পটটা একটু দেখে আসি। এ্যারয় সমেত সবাই গেল সেই মূর্তিঘরে। পিপুল নড়ল না, ঘুঙুরও না। ইবলিশ দোরগোড়ায় নেই। দরজাটা ফাঁকা লাগছে অনেকখানি।

সমস্ত মিউজিয়াম ঘরগুলো ঘুরে ঘুরে দেখে এসে রথ বলল, বড্ড গোলমাল হল হে! অনেক এলোমেলো পায়ের ছাপ দেখছি, কোনটা জেনুইন, স্পট করা মুশকিল। তোমরাও তো বেশ কয়েকবার ঢুকেছ। তবু দেখি কি হয়! এখন আর ঘর খুলে দেখিও না সকলকে। বন্ধই থাক।

বিশাল বলল, তোমার এত সব এ্যাসেট, অথচ কোনো ভালো প্রোটেকশান নেই। এত বড় ফাঁকা জায়গা! ঠিক আছে তোমার লোকজনদের ডাকো, ওদের স্টেটমেন্ট একটু নেয়া দরকার।

সবাইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ শেষ হতে প্রায় বেলা দুটো আড়াইটে। পিপুলকেও অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে নানারকম প্রশ্ন করল দুজনে। নোট নিল। আচমকা ঠ্যালা খেয়ে মাটিতে পড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ওদের কিছুতেই ভালো করে বোঝাতে পারল না পিপুল। এ্যারয়কেও

প্রশ্নের পর প্রশ্ন। কতদিন আছে এদেশে। কি উদ্দেশ্য ? ওর পাশপোর্টও চেক করল রথ।

মোটর সাইকেল স্টার্ট হওয়ার শব্দ শোনার পর গোটা বাড়ির বুক থেকে যেন পাথর নেমে গেল। ছবি, বুধা, বিশ্বনাথ, বনমালি, গতি, সকলেই বাঁচল হাঁফ ছেড়ে। কি জিজ্ঞাসা, কি জিজ্ঞাসা! বাবা রে বাবা! কথায় কথায় বাবার নামও ভোলার দাখিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসছে। সমস্ত বন্দুক, রাইফেল পরিষ্কার হয়ে গেছে মেজোমামার। টোটাও রেডি। যেন কোনো যুদ্ধ যাত্রার প্রস্তুতি।

জিপ নিয়ে এর মধ্যে দূরের জেলেপাড়া থেকে বড় পমফ্রেট মাছ এনেছিল বাবা। ব্যাসন দিয়ে গোটা গোটা ভাজা। সঙ্গে সোনা মুগের ডাল আর কাঁচা লংকা। খাওয়াটা একটু বেশিই হয়ে গেছিল, তারপরই ছোট্ট একটা ঘুম।

ঘুম থেকে উঠে মামা বলল, শুনে ঘাবড়াস না, সত্যি সত্যি আমরা কিন্তু সাংঘাতিক এনিমিকে ফেস করতে যাচ্ছি। ব্যাপারটা সিরিয়াসলি টেক করা দরকার।

বালিশের নীচে ভোজালি। লুঙ্গি-পাঞ্জাবি পরা মামার কোলের ওপর লোডেড মাউজার। ছবি সিং, বুধা সিংয়ের কাঁধে ঝকঝকে দোনলা বন্দুক। বুকে মালা হয়ে ঝুলে থাকা গুলির বেল্ট। পয়েন্ট টু-টু রাইফেলটাও নামিয়ে দিয়ে পিপুলকে দেখিয়ে দিয়েছে মেজোমামা কি ভাবে মাছির ওপর চোখ রেখে কাঁধে বাঁট নিয়ে টানতে হয় ট্রিগার। ধাক্কা লাগে সামান্য। কিন্তু দু একবার অভ্যেস করলেই সব ঠিক।

গতি, বিশ্বনাথ, বনমালি—সকলকেই হাতের কাছে লাঠি কিংবা রড রেখে দিতে বলেছে মেজোমামা। কেউ যেন একলা একলা না বেরোয় বাইরে। আর সারা রাত যেন উঠোনে ফ্লাড লাইট জ্বলে—এমনই অর্ডার।

ভেজানো দরজায় ঠক ঠক। ইবলিশের গলায় গর গর—গরর্‌।

স্টপ। কাম ইন। মেজোমামার হাত লোডেড মাউজারের ওপর।

দরজা সামান্য ফাঁক হল। ভিতু ভিতু মুখে অ্যারয়।

কি ব্যাপার ভেতরে এসো।

শার্ল—।

ঠিক আছে, ওকে আনো। মামা চোখ ইশারায় বাইরে যেতে বলল পিপুলকে। বিছানার চাদর গায়ে জড়িয়ে উঠে এলো পিপুল। পেছনে পেছনে ঘুঙুর। মামা টুক করে বালিশের তলায় ঢুকিয়ে দিল মাউজার। ওঠার আগে কোমরে ভোজালি গুঁজে নিয়েছে পিপুল। পয়েন্ট টু-টু রাইফেল এখন টাঙানো দেয়ালেই।

তারপর ইংরেজিতে কিছু কথাবার্তা। দেয়াল পেরিয়ে, জানলা ছাড়িয়ে, সে সব ফিস ফিস কথা-বার্তার দু একটা টুকরো ছুঁয়ে যায় পিপুলের কান।

চারপাশে তখন মুছে যাচ্ছে শীতের রোদ। হাতে ঘড়ি ছিল। পিপুল দেখল প্রায় পাঁচটা। নীচে, উঠোনে বাবা-মা, গতি, বিশ্বনাথ, বনমালি। বেলা শেষের রোদে ডানা ঝাপটাচ্ছে রাধা-কৃষ্ণ। তাদের ডানা থেকে ছিটকে যাওয়া জল রোদ মেখে টুকরো পোখরাজ।

পিপুল ভাবছে নীচে যাবে, তখনই মেজোমামার গলা—কাম ইন পিপুল। শার্ল আর এ্যারয় তখন বেরিয়ে যাচ্ছে!

শার্লকে পিপুল কখনও আগে দেখে নি। অথচ মেজোমামার ব্যবহার দেখে মনে হল মামা অনেকদিন থেকেই চেনে ওকে। ভেতরে ঢুকে বিছানায় বসার আগেই ঘুঙুর লাফিয়ে উঠল বিছানায়।

শোন, শার্ল এসেছিল। তুই ওকে চিনবি না, কিন্তু আমি চিনি। বেশ কবছর ভারতে আছে। ওড়িয়া, হিন্দি, বাংলা টুটাফুটা বলতে পারে। ও ধান্দায় এসেছিল একটা বড় কষ্টিপাথরের গণেশ বিক্রি করবে বলে। তা সাড়ে তিন ফুট তো হবেই, বেদী সমেত। আট হাত গণেশের, নাচছে। সারা গায়ে আবার সাপ জড়ানো। আমি

বললাম, রসিদ ছাড়া কোনো জিনিস আমি কিনি না, এতো সবাই জানে। প্রপার রসিদ দিলে ঠিক আছে, কোনো বে-আইনি ঝুট-ঝামেলায় ফাঁসতে রাজি নই।

এ্যারয়ের সঙ্গে শার্লের কি করে বন্ধুত্ব হয়, পিপুল বুঝতে পারল না। কবি-মনস্ক মানুষ এ্যারয়। অথচ শার্ল লোকটার চলাফেরা—ঠিক যেন শেয়াল। কারোরই চোখের দিকে সোজা তাকাতে পারে না।

শোন, শার্ল যে আমার কাছে এসেছিল, নিশ্চয়ই কোনো মতলবে। ও জানে আমি রসিদ ছাড়া মাল কিনি না। তবুও হঠাৎ গণেশের টোপ, আর আমার এই বর্শাটা যাওয়ার পরেই। ঠিক বুঝতে পারছি না।

বাইরে রোদ ফুরিয়ে গেল। শীত শীত। এসব কথা শুনতে শুনতে পিপুল টের পেল, তার ঠাণ্ডা লাগছে। ঘুঙুরও দিব্যি ল্যাজে মুখ ঠেকিয়ে আছে শুয়ে।

চিলেকোঠার ঘরে এ্যারয় আপন মনে টেপ বাজাচ্ছিল। এই শীতে, দূরে জলায় নেমেছে যাযাবর পাখিরা। খুব ভোরে উঠে তাদের জলে নামা, সাঁতার, বাতাসের শব্দ, আড্ডা, গল্পগুজব, সব কিছু রেকর্ডিং করে এনেছে। সেই সব বিদেশী পাখিদের ডানার ঝাপটায় ঝাপটায় কেমন অদ্ভুত সুর।

চিলেকোঠার এই ঘরে হালকা রঙের আলো। চারপাশে পরিচিত তামাকের গন্ধ, সেই একই পোশাকে এ্যারয়ের শব্দ-সাধনা। তার ডান হাতের পাতার শাদা ব্যাণ্ডেজে হালকা আলো ডুবে গেছে।

এমন বুঁদ, তন্ময় এ্যারয় পিপুলকে দেখেই কেমন যেন সচকিত একটু। তাড়াতাড়ি হাঁসেদের, পাখিদের ব্যাপারটা বলে অবস্থা সামাল দেয়। পিপুল গোটা ঘর লক্ষ্য করে। এই আলোয় এখন এই এখানকেই মনে হয় যেন কোনো স্বপ্নপুরী, যা এ পৃথিবীর নয়।

এ্যারয় প্রথমটায় পিপুলকে বসতে বলে না। তারপর হঠাৎ ঘুমজাগা মানুষের মতো বসে পড়তে অনুরোধ করে। পিপুল বসে না।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এ্যারয় টেপ বন্ধ করে। তারপর আচমকা উঠে পড়ে বলে, চলো একটু বাইরে বেরোই।

সিঁড়ি বেয়ে একতলায়।

উঠোনে সবাই। আকাশে চাঁদ, হালকা মেঘ আর তারা। এটা বোধহয় শুক্লপক্ষ। ঘুঙুর আর ইবলিশ খেলছে। একটু আগেই জ্বলে উঠেছে আলো আর আলো। মামা একলা চেয়ে আকাশের দিকে।

এ্যারয় খুব হালকা চালে জমাবার চেষ্টা করছে মা-বাবার সঙ্গে। বাবা একটু একটু কথা বলে চুপ থাকে। এ্যারয় যত না কথা বলে, হাত নাড়ে তার চেয়ে বেশি! বারবার একই কথা বলে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে। মা অনেকটাই চুপচাপ। মাঝে মাঝে ভাঙা ইংরেজিতে একটু-আধটু।

হঠাৎই এ্যারয় বলল, চলো একটু বাইরে ঘুরে আসা যাক। এমন জ্যোৎস্না, এমন শীত, ঘরে থাকার কি দরকার?

পিপুল যাবে যাবে ভাবছে। মামা সঙ্গে সঙ্গেই বলল, রাত হয়েছে, এখন আর বেরিও না।

একথা শোনার পর পিপুলের আর হিম্মত নেই বাইরে যাওয়ার। অথচ এ্যারয়, বাধ্য এ্যারয়, নিতান্ত নিশি পাওয়া মানুষের মতোই জ্যোৎস্নায় ভিজতে ভিজতে চলে যাচ্ছিল সামনের রাস্তা দিয়ে, বন্ধ গেট ঠেলে। তার চলে যাওয়া দেখতে দেখতে পিপুলের মন খারাপ হয়ে গেল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে মামা আরও গম্ভীর। সবাই খেয়ে যাচ্ছে চুপচাপ। এছাড়া বাড়তি কোনো শব্দ নেই। হালকা মুরগীর ঝোলে রুটি ডুবোতে ডুবোতে মামা হঠাৎ বলল, এ্যারয় সন্ধ্যের পর হঠাৎ কোথায় গেল বল তো? সঙ্গে আবার তোকে নিয়ে যেতে চাইছিল!

পিপুল একটা বড় হাড়কে অনেকক্ষণ কায়দা করতে পারছিল না।

হাড় মুখ থেকে বের করে বলল, ও তো প্রায়ই সন্ধ্যেবেলা বেড়াতে বেরোয়, আমি দেখেছি আগেও। আবার কাজেও তো যায়। টেপ, জিনিস-পত্তর নিয়ে।

কিন্তু এখন তো ওর হাতে টেপ নেই।

না, থাক, হয়ত এমনিই…।

এই শীতে এমনই, ঠিক বিশ্বাস হয় না যেন। তাছাড়া শার্ল আসার পরই সমস্ত ছবিটা বদলে গেছে, জানিস!

কেন?

তুই শার্লকে চিনিস না। একটা ডেন্‌জারাস এলিমেণ্ট। আমি চিনি দু-তিন বছর। ওড়িশা গভর্মেন্ট ওকে একবার থ্রেটনিং দিয়েছিল মূর্তি ইত্যাদি পাচারের ব্যাপারে। এ্যারেস্ট করেনি, বিদেশী তাই। কিন্তু রথ বা বিশাল—কেউই ওকে দুচক্ষে দেখতে পারে না। মাঝে বেশ কিছুদিন বেপাত্তা ছিল। এখন হঠাৎ কোত্থেকে যে উদিত হল! আর এ্যারয়ও কেমন জুটে গেল ওর সঙ্গে।

হাড় শেষ। ছিটেফোঁটা বাকিটুকু তখন টেবিলের নীচে ঘুঙুরের দাঁতে।

ঝোলের বাটিতে একটা ছোট চুমুক দিয়ে মামা বলল, এ্যারয় যে কি করে শার্লের পাল্লায় পড়ল, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

বন্ধুত্ব হতেই পারে—।

তাই বলে শার্লের সঙ্গে—!

মামা উঠে পড়ল। এখন বাজে রাত আটটা। বাবা-মা আস্তে আস্তে খাচ্ছে। হ্যাংলা ঘুঙুর এখন টেবিলের নীচে। বাবা-মার পায়ের কাছে।

মুখ হাত ধুয়ে পিপুল আর মেজোমামা দোতলায়। গেট আগেই বন্ধ করে দিতে বলেছে মেজোমামা। বন্দুক কাঁধে গার্ড দিচ্ছে ছবি সিং বুধা সিং।

মা-বাবা দোতলায় উঠে এসেছে। বারান্দায় বসে এখন ছড়ানো

গল্প। সেই ছোটবেলার দিন, দেশের বাড়ি, মায়ের ছোটকাকা—যিনি রোজ সকালে উঠেই ভুলে যেতেন সবাইকে। এমন কি বৌ-ছেলে-মেয়েকেও চিনতে পারতেন না। তাঁর নাম ছিল আলো। সবাই বলত, ভুলো-আলো।

রোজ দিন ঘুম ভাঙার পর তাঁর কানের সামনে সকলে চেঁচিয়ে বলত, আমি তোমার অমুক! আমি তোমার তমুক! অনেকক্ষণ শোনার পর তিনি ফিরে আসতেন এই পৃথিবীতে। এই ভুলো-আলো—মায়ের ছোটকাকা অনেক রাতে বসে থাকতেন নিজেদের শ্মশানে। সেই শ্মশান উঠোন, আমবাগানের পর বড়পুকুরের পাড়ে। মায়েদেরই জমির ওপর। বাড়ির কেউ মারা গেলে, তাকে পোড়ানো হত ওখানেই। রাতের বেলা ভুলো আলোর গায়ে কোনো কাপড় থাকত না। গভীর রাতে হঠাৎ তাঁকে কেউ দেখে ফেললে ভয়ে রামনাম জপতে জপতে দৌড় দিত।

স্মৃতির সুতোয় বোনা সেই প্রাচীন-মসলিন একবার মেলে ধরছিল মেজোমামা, একবার মা। তার জরির কাজ, সুতোর নকশা দেখে পিপুলের শুধুই বিস্মিত হওয়া।

মামা বলছিল, মনে আছে তোর, একবার ঝড়ে আমাদের গোটা টিনের চালাটা উড়ে গিয়ে পড়ল, সারা রাত ধরে কি দুশ্চিন্তা। এইসব আনতাবড়ি, এলোমেলো আলোচনা তেমন জমল না। কারণ সবাই একটা চাপা দুশ্চিন্তার মধ্যে।

মামা হঠাৎই বলল, বিন্দি, প্রতুল তোমরা শুয়ে পড়। রাত তো দশটা হল প্রায়। এ্যারয় এখনও ফিরল না। আমার কেমন যেন মনে হচ্ছে···যাক গে···।

বাবা উঠে পড়লেও মা তেমনিই ঠায় বসে।

মেজোমামা একটু ধমকেই বলে উঠল, কি হল? পিপুল আমার সঙ্গেই শোবে। তোমরা ঘুমিয়ে পড়।

সে রাতে ভালো করে ঘুম এলো না। বিছানায় একবার এপাশ, আরেকবার ওপাশ।

হঠাৎ মামা বিছানার ওপর বসে চাপা গলায় বলে উঠল, চল্, বেরিয়ে পড়ি। এ্যারয় এখনও ফেরে নি।

তৈরি হতে পাঁচ মিনিট। সেই জিনসের প্যান্ট, সোয়েটার, মাথায় টুপি, পায়ে কেডস। মামাও একই পোশাকে প্রায়। কেবল মাথায় বড় টুপি। হাতে লোডেড মাউজার, ভারি টর্চ। পিপুলের কোমরে বাহারি হাতলঅলা ভোজালি। পিপুলের কাঁধে উঠে এলো পয়েন্ট টু-টু রাইফেল। ঘুঙুর দিব্যি বিছানায় মজায় ঘুম মারছে। কোনো আওয়াজ না দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় তালা দিল পিপুল। চাবি মামার হাতে।

খুব সাবধানে অন্ধকার বারান্দা পেরিয়ে নীচে।

কোথাও কোনো শব্দ নেই। ইবলিশ পায়চারি করছিল উঠোনে। মামার সামনে এসে কুঁ-কুঁ করে পায়ে মাথা ঘষতেই, মামা ওর মাথায় আস্তে আস্তে চাপড় দিয়ে বলল, নিয়ে যাবো না। এখানেই থাক।

তাড়াতাড়ি ছবি সিং বুধা সিং এসে স্যালুট দিল মামাকে। মামা জিগ্যেস করল, এ্যারয় ফিরেছে?

ওরা দুজনেই ঘাড় নাড়ল—না।

খুব আস্তে খোলা হল গেট। জিপের স্টার্ট বন্ধ করে তাকে ঠেলে বাইরে নিয়ে এলো ছবি সিং, বুধা সিং, পিপুল। মামার হাত স্টিয়ারিংয়ে। অনেকটা রাস্তা আসার পর জিপে স্টার্ট দিল মামা। ওরা তিনজন তখন ঘামছে।

ছবি সিংকে একলা ফিরে যেতে বলে বুধাকে মামা বলল গাড়িতে উঠে আসতে। এভাবে ঠেলে নিয়ে আসার কারণ বুঝল পিপুল, যাতে জিপের শব্দে কেউ না টের পেয়ে যায় এই নৈশ অভিযান।

মামার পাশে পিপুল। পেছনের সিটে বুধা সিং।

জিপ দৌড়চ্ছে।

চারপাশে পাথুরে জমি। তার ওপর জ্যোৎস্নার সর। কোথাও কোথাও আটকে আছে অন্ধকার। গাছের পাতায় চাঁদের আলোর নকশা। বেশ শীত। কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে হাওয়া, আর হাওয়া।

উইণ্ডস্ক্রিনে জড়িয়ে যাচ্ছে চাঁদের আলোমাখা কুয়াশা। আশে-পাশের ছুটে যাওয়া জঙ্গল, ধূ-ধূ প্রান্তর, সব কিছুই যেন এ-পৃথিবীর নয়। দূ-রে কোথায় ডেকে উঠল শেয়াল। মামা জিপটাকে টার্ন করাল ডান দিকে।

কোথায় যাচ্ছি আমরা—এখন একটা প্রশ্নের বুড়বুড়ি পিপুলের বুকের তলায়। তবু জিগ্যেস করা যাবে না, এমনই মিলিটারি ডিসিপ্লিন মামার।

এই শীত, শিশির-কুয়াশা মাখা গভীর রাত—এ্যারয়ের ফিরে না আসা, আর ওদের হঠাৎ এমনি ভাবে সশস্ত্র বেরিয়ে পড়া—সবটাই খুবই অবাক ব্যাপার পিপুলের কাছে।

আবার বাঁ দিকে ফিরল জিপ। তারপর একটা মাঠ ও সামনে কালো পাথরের এক মন্দির।

জিপ বন্ধ করে মাটিতে নামল মামা। হাতে গুলি ভর্তি মাউজার। পিপুলকে বলল, রাইফেল রেডি রাখ। চল আমরা একটু ছুটে ওই পাথরটার আড়ালে গিয়ে পজিশন নি।

একটা কালো পাথর—ঠিক যেন বুনো মোষের পিঠ। তার ওপর পড়েছে আকাশ-আলো। চকচক করছে আরও। এক ছুট দিয়ে ঠিক মিলিটারির মতোই কাঁধ থেকে রাইফেল নামিয়ে পজিশন নিল পিপুল, সেই পাথরের আড়ালে। তার বুকের ভেতর তখন লক্ষ সৈন্যের রুট মার্চ। কপালে বিনবিনে ঘাম।

দাঁড়া, এক জায়গায় থাকলে হবে না। তুই এখানে থাক বুধাকে নিয়ে। আমি ওই বড় গাছটার আড়ালে কভারিং পজিশনে যাচ্ছি। গুলি চালানোর সিগন্যাল পেলেই চালাবি।

বুকে ভর দিয়ে পাথরের আড়ালে শুয়ে পড়ল পিপুল। টু-টু রাইফেলের নল শুধু বেরিয়ে আছে। বুঝি বিঁধে ফেলেছে আকাশ। হঠাৎ ক্র্যাঁ ও-ও-কোঁ-ক্র্যাঁ-ও-ও-কোঁ শব্দ তুলে, ডানা ঝাপটে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল কোনো রাতচরা পাখি।

একটু কেঁপে উঠে বন্দুকের হাতল আরও শক্ত করে চেপে ধরল পিপুল। বুধা চুপচাপ। তার ঘামে ভেজা সপসপে গরম কাপড়ের খাকি ইউনিফর্মের পিঠে চাঁদের আলো। ঠিক দেখাচ্ছে যেন জল শুকিয়ে যাওয়া কোনো কালচে কাদাগলা গর্ত।

মামা কভারিং পজিশন নিয়েছে গাছের আড়ালে।

আবার সব চুপ।

ওই মন্দির একলা জেগে আছে এই মাঠের ভেতর। তার সিল্যুট চেহারায় চাঁদের আশ্চর্য মায়া।

তারপর সে এক যুদ্ধই বটে।

একটি ছায়া শরীর, তার পেছনে পেছনে আরও দুটি ছায়া শরীর নেমে আসে সামনের মাঠে।

ওরা কি মন্দিরেই ছিল নাকি?

ভাববার আগেই কি এক অপার্থিব শব্দ, প্রচণ্ড আলোর বন্যা আর দুলুনি চারপাশে। আকাশ চিরে নেমে এলো রূপোলি রঙের বিশাল ডিম। তারপর মাটিতে নেমে, থেমে, তার ঢাকনা গেল খুলে।

চারপাশ গুমগুম শব্দে কেঁপে উঠল।

থৈ-থৈ জ্যোৎস্নায় তিনজন মানুষ তৈরি হয়েছিল যুদ্ধে। তাদের একজনের হাতে ধরা চুরি যাওয়া বর্শা, অন্য হাতে পিস্তল। বাকি দুজনেও সশস্ত্র। শুধু পায়ের নড়াচড়া, ভাবভঙ্গি থেকেই বুঝে নেয়া যাচ্ছিল—এখানে যুদ্ধ হবে।

মামা কোনো সিগন্যাল দিচ্ছে না। তাই পিপুলও বুঝতে পারছে না কি দরকার। এসব আদৌ সত্যি না স্বপ্ন ভাবতে গিয়ে একহাতে চোখ কচলে নিচ্ছে বারবার। অন্য হাত রাইফেলে। তালু ঘেমে

উঠছে। তবু সত্যি কিছুতেই যেন সত্যি হয়ে ফুটে উঠছে না পিপুলের সামনে।

সেই ঢাকনা খোলা ডিমের ভেতর থেকে নেমে এলো জ্যোৎস্না রঙের দড়ি। পাটে পাটে বেঁধে ফেলল তিনজনকে। একটা, একটা নয়, দুটো গুলির শব্দ ছিঁড়ে ফেলল রাত্রির এই মায়াময় আবরণ।

পিপুল চমকে উঠলেও বুঝল মামা গুলি চালায় নি। আর সেও না। তাহলে?

সেই জ্যোৎস্না রঙের দড়ি বাঁধা অবস্থায় ওই তিনজনে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। মুখ দিয়ে কোনো শব্দও বেরচ্ছে না।

পিপুল কি করবে? ছুটে যাবে, নাকি চালিয়ে দেবে গুলি?

সেই অদ্ভুত দড়িতে বাঁধা তিন জনের মাঝখানে পড়ে বর্শা। চাঁদের আলো পড়ে আছে তার ওপর অবহেলায়। অথচ কি মহার্ঘই না লাগছে বর্শার হাতল, ফলা—মণিমুক্তো মিনের কারুকাজ।

তারপর কোন সে যাদুমন্ত্র বলেই প্রায় উড়ে গিয়ে ডিমের ভেতর ঢুকে পড়ল উজ্জ্বল বর্শা। ডিমের ঢাকনা হল বন্ধ।

চোখ ধাঁধানো আলো, গুমগুম শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। আকাশে উঠে যাচ্ছে ডিম। মিলিয়ে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে আকাশের গায়ে।

তারপর যে-কে সেই জ্যোৎস্না, সমস্ত চরাচর তেমনি নিঝুম। গাছের আড়াল থেকে এবার মামার গলা শোনা গেল, শার্ল ও আর সবাই যেমন আছ তেমনি থাকো। নড়লে-চড়লেই গুলি…।

তিন জনে শুয়েই আছে।

গাছের আড়াল থেকে, পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এবার বুকে হেঁটে হেঁটে এগোয় মামা, বুধা, পিপুল। তাদের রাইফেলের নলে, বন্দুকের মাথায়, মাউজারের মুখে চাঁদের আলো গোলা পায়রার গলার রং হয়ে পড়ে আছে।

ওই তিন জনের হাত তিনেক দূরে এসে ওরা থামে।

মাটির ওপর ওদের তিনজনেরই রিভলবার,পিস্তল খোলামকুচি হয়ে পড়ে। আর ধুলোর ওপর বর্শার হাতলের শেষ আঁচড়টুকু এখনও মিলিয়ে যায় নি। যেমন সাপ হেঁটে গেলে দাগ থেকে যায় শুকনো বালি, ধুলোর ওপর।

সব সত্যি, কিছুই স্বপ্ন নয়—ভাবতে ভাবতে পিপুলরা তিনজন বন্দুকে হাত আলগা করে।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তিনটে মুখ—শার্ল আর এ্যারয় ওদের চেনা। বাকি একজন অপরিচিত। তিনজনেই অজ্ঞান। অথচ কোনো বাঁধনই নেই কারর হাতে পায়ে। কোথায় গেল সেই জ্যোৎস্না রঙের দড়ি!

মাউজার পিস্তল হাত বদল করে নিয়ে মামা বলল, গাঁজাখুরি বলে মনে হলেও জিউসের বর্শা বোধহয় ফেরত নিয়ে গেল জিউস। —এমনটিই হল হয়ত। পিপুল বা বুধার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরছিল না। পিপুলের চোখ আটকে ছিল সেই মাটির ওপর, যেখানে এখনও বিশাল ফাটা দাগ—ওখানে নেমেছিল আকাশ ভাঙা ডিম।

বুধা আর পিপুলকে পাহারায় রেখে মামা সঙ্গে সঙ্গে জিপ চালিয়েছিল থানার দিকে।

রাইফেল তুলে পিপুল দেখছিল চাঁদের ডুবে যাওয়া। শেষ রাতের কি অসামান্য নরম আলো। যেমন শরতের কাশফুল, নদীর ধারের মিহিন শাদা বালি। পেছনে একলাই দাঁড়িয়ে সেই কালচে মন্দির, তার সারা গায়ে রহস্যের জামেয়ার। বার বার ভাবছিল পিপুল মানুষ কেন যে এত লোভ করে, আর তাই তো যত যুদ্ধ, অশান্তি!

ভোর ভোর এসে পৌঁছল তিনটে জিপ। ত্বটো পুলিশের। একটা মামার। সাবইন্সপেক্টর রথ আর ও. সি পট্টনায়ক নিজে এসেছেন। সঙ্গে জনা সাত-আট সেপাই। সেপাইদের সকলের হাতেই রাইফেল।

আকাশে ফিকে সোনালি আঁচড়। ত্ব একটা কালো কালো উড়ন্ত পাখি, ফুটকি হয়ে ফুটে উঠছে আকাশের মুখে। একটা ত্বটো পাখির ডাক।

ওরা তিনজনেই তখনও অজ্ঞান।

ওদের ধরাধরি করে জিপে তুলতে বেশি সময় লাগে নি। সঙ্গে তাদের হাতিয়ারগুলোও। তারপর সোজা থানায়।

আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা ইন্টারপোল এজেন্ট এ্যারয়ের পরিচয় পেয়ে পুলিশ জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়েছে। যদিও এই গোটা ব্যাপারটা ফয়সালা হওয়ার আগে এ্যারয় যেতে পারবে না মেজোমামার বাড়ি ছেড়ে।

আন্তর্জাতিক মানের অপরাধী শার্লকে পুলিশ জড়াবে নানান মামলায়। তার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। শার্লের নামও অনেক-গুলো। সব কথা বেরবে আস্তে আস্তে। সত্যি বলতে কি শার্লকে ফলো করেই এ্যারয়ের ভারতে আসা।

মূর্তিঘর থেকে বর্শা চুরি করে, পুরনো, প্রায় না জানা, ভক্ত না আসা বিগ্রহহীন এই মন্দিরে চুপি চুপি রেখে গেছিল এ্যারয় সে রাতে। তার হাতে সামান্য লেগেছিল বর্শা খুলতে গিয়েই। তখন এ্যারয়ের ঘরে টেপ রেকর্ডারে বাজছিল ক্লিফ রিচার্ড।

এই গোটা চুরির ব্যাপারটাই করতে হয়েছিল শার্লকে টোপ দেয়ার জন্যেই। আরও লোভ বাড়ানোর জন্যেই শার্লকে মেজোমামার কাছে টেনে এনেছিল এ্যারয়।

শার্ল একলা যায় নি মন্দিরে বর্শার ধান্দায়, সঙ্গে ছিল তার সঙ্গী।

সেই সময়েই একটা মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ে যেত এ্যারয়ের সঙ্গে। দুপক্ষই তৈরি। কিন্তু তার আগেই আকাশ থেকে...।

এসব খবর থানায় বসে গল্প করতে করতেই দিল মেজোমামা। বুধা সিং তখন থানার বেঞ্চে বসে রীতিমতো ঢুলছে।

থানায় আসার আধঘন্টা পরে জ্ঞান ফিরল শার্ল, এ্যারয় আর শার্লের সঙ্গীর।

জিপে বাড়ি ফিরছিল পিপুল, মেজোমামা আর বুধা সিং। বাইরে তখন শীতের আলতো রোদ। ঠাণ্ডা হাওয়া। পেছনের সিটে বুধা সিং ঘুমিয়ে কাদা।

জিপ চালাতে চালাতে মেজোমামা বলল, এ্যারয়ই যে বর্শা সরিয়েছে টের পেলাম মূর্তিঘরে ঢুকেই। তোর মনে আছে, কি একটা কুড়িয়ে ছিলাম আমি। আর কিছুই না, একটা ছোট্ট ক্যাসেট।

বুক পকেট থেকে কখন যে পড়েছিল, ইন্টারপোলের গোয়েন্দা তা টেরও পায় নি। আর এই মন্দিরের খবর জানলাম কি করে, তা যদি জিগ্যেস করিস, তা হলে বলব কয়েকদিন আগে এ্যারয়ই আমায় এনেছিল এখানে, শব্দ রেকর্ডিং করার জন্যে। তখনও তোরা আসিস নি।

মুখে এক চিলতে হাসি ঝুলিয়ে মেজোমামা আবার বলল, বর্শাটা খোয়া গেল বটে, কিন্তু কিরকম একটা সাংঘাতিক অ্যাডভেঞ্চার হল বল! আর ওই আকাশ ফুঁড়ে আসা ডিম—এখনও ভাবতে পারছি না! কি ব্যাপার বল তো? বর্শাটা সত্যি সত্যি আলেকজাণ্ডারের? আর তা দিয়েছিল দেবরাজ জিউস?

পিপুল কোনো কথারই উত্তর দিতে পারছে না। আনন্দে একটা ফাইভস্টার চিবোতে ইচ্ছে করছে। আর মন কেমন করছে মা আর ঘুঙুরের জন্যে।

বাড়ি এখনও কত দূর!
